বাতায়ন

# কাহিনী ও অন্যকথা

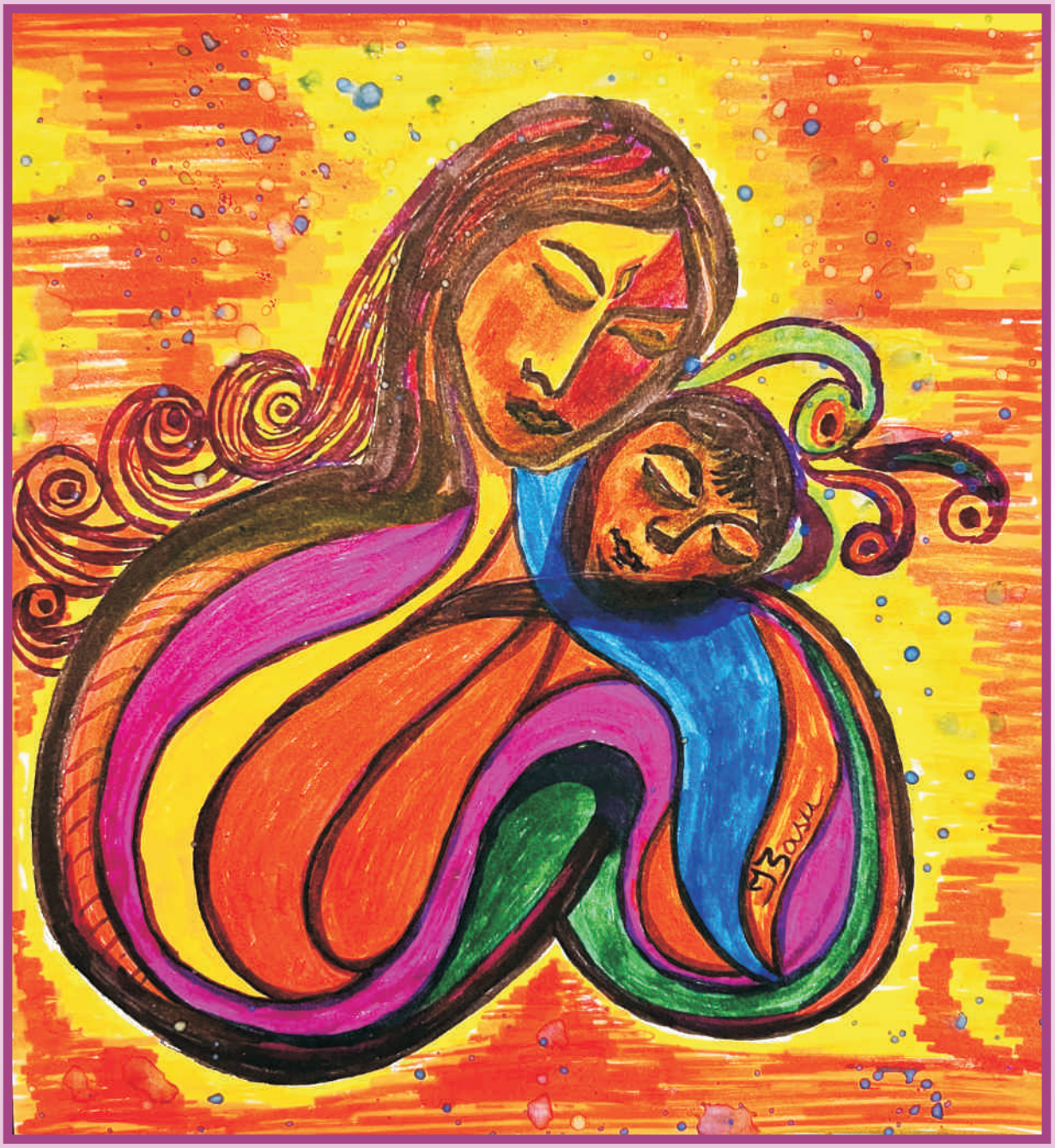

পলাশের রঙে রাঙিয়ে খেলবো হোলি তোর সাথে
সেই গোধূলি বিকেলে মনে মনে।
তুই আসবি আমার কোলে সারা গায়ে রঙ মেখে –
বলবি চেনো তো আমায় ?
ডাকবি সেই চেনা সুরে – তোর মা বলে ।

**Angel of Kolkata, Writers Building**

# Batayan


সম্পাদিকা ঃ

রঞ্জিতা চ্যাটার্জী



Volume 31 | March, 2023


*A literary magazine with an International reach*

বাতায়ন

Issue Number 31 : March, 2023

**Editor**
Ranjita Chattopadhyay, IL, USA

**Sub Editor**
Sugandha Pramanik
Melbourne, Australia

**Design & Art Layout**
Kajal & Subrata, Kolkata, India

**Website Support**
Susanta Nandi, India

**Chief Editor & CEO**
**Anusri Banerjee**
Perth, Western Australia
a_banerjee@iinet.net.au

**Published By**
**BATAYAN INCORPORATED**
**Western Australia**
**Registration No. : A1022301D**
E-mail: info@batayan.org
**www.batayan.org**

## Photo Credit

### Front Cover & Caption

**Tanima Basu** — **পলাশের রঙে রাঙিয়ে খেলবো হোলি তোর সাথে**

**তনিমা** পদার্থ বিদ্যায় স্নাতক । ইউনিভার্সিটি অফ মিশিগানের বায়োস্ট্যাটিস্টিক্সে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী সুযোগ করে দিয়েছে সংখ্যাতত্ত্ব ব্যবহার করে অন্তর্হিত সত্য উদ্ঘাটন করার । বিজ্ঞানের ছাত্রীর অবসর সময় কাটে কাগজে আঁকিবুকি করে, বিভিন্ন মিডিয়ামের সাথে পরিচিত হয়ে – কখনো কাগজে, কখনো স্ক্রিনে । ভালবাসে ছবি তুলতে রঙীন প্রকৃতির এবং আপনজনদের ।

### Inside Front Cover

**Balarka Banerjee**

**Balarka Banerjee** is a Molecular Biologist by profession and an executive in a Biotech company. Besides science his other passions are Drama — writing, acting, directing — Poetry and Art. He likes good cinema and music. He is a foodie and a good cook. No wonder he enjoys writing about his experiences and interests.

### Title Page

**Rina Sen**

**Rina Sen**, born and brought up in Deolali, Maharashtra. Lived in Tea gardens in North Bengal, Assam and Kerala. At present, she lives in Kolkata. She love to cook and to keep a good house. Indoor plants is her passion. Currently an Educational Consultant. Rina enjoys teaching children of different age groups, online as well as at home. Rina plays golf in her spare time.

### Back Cover

**Soumen Chattopadhyay**

Saumen is an avid outdoor enthusiast and enjoys hiking, trekking, and photography. He also takes part in recitation, drama, mind science. Saumen is an entrepreneur in the field of investment research and portfolio management. He lives in Chicago.

বাতায়ন পত্রিকা **BATAYAN INCORPORATED, Western Australia** দ্বারা প্রকাশিত ও সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত । প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ছাড়া, এই পত্রিকায় প্রকাশিত যে কোন অংশের পুনর্মুদ্রণ বা যে কোন ভাবে ব্যবহার নিষিদ্ধ । রচনায় প্রকাশিত মতামত সম্পূর্ণ ভাবে রচয়িতায় সীমাবদ্ধ ।

Batayan magazine is published by **BATAYAN INCORPORATED, Western Australia**. No part of the articles in this issue can be re-printed without the prior approval of the publisher. The editors are not responsible for the contents of the articles in this issue. The opinions expressed in these articles are solely those of the contributors and are not representative of the Batayan Committee.

# পত্রিকার কথা

২০২৩ সালের এটিই প্রথম বাতায়ন সংখ্যা। অনেকেই তাই আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করে আছেন। তাঁরা আশাহত হবেন না। পত্রিকার এই সংখ্যাটির প্রধান আকর্ষণ হল ছোটগল্প ও প্রবন্ধ। বাংলা গদ্যসাহিত্যে নানাবিধ পরীক্ষানিরীক্ষা চলছে আজকাল। পাঠক হিসেবে তার একটা চিত্র দেখতে পাই আমি। বাতায়নের এই সংখ্যার লেখাতেও তার প্রতিফলন। যথার্থ সৎ লেখা একদিকে যেমন পরিচিত পাঠকদের আনন্দ দেয়, তেমনই তা নতুন রুচিসম্পন্ন পাঠক তৈরী করে। লেখার শিল্প ও সেই শিল্পের সঙ্গে জড়িত সব মানুষেরাই তাই একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন সাহিত্যজগতে। তা হল লেখক আর পাঠকের পারস্পরিক নির্ভরতার ক্ষেত্রটিকে আরও প্রশস্ত করে তোলা। সাহিত্য পত্রিকার ভূমিকাও ঠিক তাই।

তবে পত্রিকা বেরোতে ইংরাজী বছরের তৃতীয় মাস হয়ে গেল মানে কিন্তু এই নয় যে "বাতায়ন" এর কর্মকাণ্ড স্থগিত ছিল। ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে বাতায়ন ধারাবাহিক 'কাগজের নৌকো'র একটি সংখ্যা ও আমাদের ইংরাজী লেখা সংবলিত পত্রিকা Balcony-র একটি সংখ্যা। কলকাতা পুস্তকমেলায় বাতায়ন স্টলে প্রবাসী সাহিত্যপ্রেমী ও সাহিত্যচর্চাকারীদের জোরদার আড্ডার খবর আমি শিকাগোতে থেকেই পেয়েছি। সে কথা বিশদে লিখেছেন সঞ্জয় চক্রবর্তী। বইমেলাতে প্রকাশিত হয়েছে রমা জোয়ারদারের বই "চা ঘর" আর সঞ্জয় চক্রবর্তীর "ধুলো রঙের বিকেল"। Stall নম্বর F6 এ ক্যানবেরাবাসী সিদ্ধার্থ দে'র সঙ্গে আলাপ হয়েছে লস এঞ্জেলস শহরের কল্লোল চ্যাটার্জীর। ভাব, ভাবনা ও বন্ধুত্বের দেওয়া-নেওয়া হয়েছে। এ কি কম প্রাপ্তি ? আমাদের ভারী আনন্দ হয়েছে পৃথিবীর নানা প্রান্তের বাংলাসাহিত্যপ্রেমীদের মধ্যে এই যোগসূত্র স্থাপনের ব্যাপারে একটা ছোট্ট ভূমিকা পালন করতে পেরে। "বাতায়ন" পত্রিকার সার্থকতা মানুষে মানুষে এই সম্প্রীতির বন্ধন তৈরী করার মধ্যে।

বন্ধুদের সহযোগিতা ও ভালবাসা পাথেয় করে আমাদের যাত্রাপথের নতুন বছর শুরু করলাম। সারা বছর ধরে সঙ্গে থাকুন সবাই।

বাসন্তিক শুভেচ্ছাসহ,

**রঞ্জিতা চট্টোপাধ্যায়**
সম্পাদক, বাতায়ন পত্রিকাগোষ্ঠী

# উৎসব, অবকাশ, বইপড়া

ফসল তোলা হল ঘরে। নিঃসীম শূন্যতা জমিতে। সেই একই শূন্যতা বুকের মধ্যেও। প্রতিমার ভাসান হয়ে গেছে মাসখানেক আগে। তাই বোধহয় এই খালি খালি ভাব। কিন্তু ভাসান মানেই তো আর এক বোধনের প্রতীক্ষার শুরু। প্রস্তুতিও। তাছাড়া এ প্রবাসে মা আনন্দময়ী তো তিথি মেনে আসেন না। তাঁর আবাহন লেগেই আছে কোথাও না কোথাও। বিগ্রহহীন মণ্ডপ বা মাঠের মধ্যে বাঁশ আর কাপড়ের স্তূপ ও তো চোখে পড়ে না এখানে। প্রতিমা বিসর্জন হয়ে গেছে একথা মনে করানোর আয়োজন নেই পথেঘাটে। তাও বারেবারেই মনটা হুহু করে ওঠে। কি যেন হারিয়ে গেছে। এবারের Fall ভারী সুন্দর হয়েছে। সোনালী রোদ ঢেউ খেলে যায় গোলাপী, কমলা, লাল, হলুদ পাতায়। রঙের উৎসব শেষ হলেই দীর্ঘ শীতের পালা। তাই কি শীতলতা ঘিরে ধরতে চায় মন ? উৎসবের আবহে স্বজন হারানোর বেদনা হয় গাঢ়তর। কোজাগরীর কূলপ্লাবী জ্যোৎস্না মেখে ঝলমল করে ফেলে আসা মুহূর্তেরা।

শেষ বিকেলের পড়ন্ত আলোয় বাড়ীর সামনের রাস্তায় ঢোকার মুখে দাঁড়িয়ে পড়ি। মনে হয় গাছে গাছে জ্বলে উঠেছে দীপমালা। অযোধ্যানগরী কি এমন দেখাচ্ছিল দুই রাজপুরুষ আর এক রাজবধূর ঘরে ফেরার দিনটিতে ? দীপাবলী উৎসবের কথা মনে পড়ে যায়। "যাক অবসাদ বিষাদ কাল।" শুভ হোক সবার। আলোয় আলোয় ঘুচে যাক সব কালো।

"আজ দীপাবলী। বিশালার ঘরে ঘরে ধনদাত্রী লক্ষ্মীর আরাধনা, অলক্ষ্মীর বিদায়। সন্ধ্যায় এই বিশালা নগর – অবন্তী দেশের রাজধানী উজ্জয়িনী, কণকশৃঙ্গ মহাকালেশ্বর মন্দির, দুই নদী শিপ্রা, গন্ধবতীর বুক দীপের আলোয় আলোকিত হবে। অবন্তী দেশের প্রতিটি গৃহের দুয়ারে, বাতায়নে প্রদীপ জ্বলবে। আজ দীপোৎসব, আলোকোৎসব, কোথাও কোন অন্ধকার থাকবে না।"

মনের গভীরে জ্বলে উঠল অপূর্ব এক আলো। মুহূর্তে পৌঁছে গেলাম ভারতবর্ষের এক প্রাচীন নগরীতে। বর্ণনার কুশলতায় বহুযুগ আগের সেই দীপাবলীর রাতের আলোকময় সন্ধ্যার ছবিটি আঁকা হয়ে গেল। সাহিত্যিক অমর মিত্রের "ধ্রুবপুত্র" উপন্যাস শুরু থেকেই পাঠকমনে সঞ্চার করে এক মুগ্ধতার বোধ। অবন্তী দেশ ও উজ্জয়িনী এ উপন্যাসে একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। কিন্তু পড়তে পড়তে আবিষ্কার করি প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষই হল এ উপন্যাসের পটভূমি। শিপ্রা নদী আর তার আশেপাশের জনপদ, পশ্চিমে সৌরাষ্ট্র ও মরুদেশ, উত্তর পশ্চিমের সিন্ধুনদ, পুরুষপুর, গান্ধার ও বাহ্লিক দেশ, হিন্দুকুশ পর্বতমালা, অক্সাস নদী, দক্ষিণের বিদিশা নগর, পুবের পাটুলিপুত্র থেকে লোহিত্যনদ – প্রায় দু'হাজার বছর আগের ভারতবর্ষ তার বর্ণময়তা আর বৈচিত্র্যে জীবন্ত হয়ে উঠেছে উপন্যাসের পাতায় পাতায়। বিগত দুই দশকেরও বেশী সময় ধরে আমি বাংলার বাইরে। কিন্তু যে ভাষায় পৃথিবী রূপরসবর্ণগন্ধময় হয়ে ধরা দিয়েছে শিশু আমির চেতনায় সেই ভাষাটির প্রতি আজও অবোধ টান। সে ভাষায় ভাল লেখা পেলে মন ভাললাগায় ভরে যায়। শ্রী অমর মিত্র তাঁর "ধ্রুবপুত্র" উপন্যাসের জন্যে ২০০৬ সালে আকাদেমি পুরস্কার পান। আমার আক্ষেপ এই উপন্যাসটি আমি এতদিন পরে হাতে পেলাম। দীপাবলী উৎসবের প্রসঙ্গে উপন্যাসটির কথা মনে পড়ে গেল।

আসলে এখন উৎসবের মরশুম। সেই দুর্গাপুজো, নবরাত্রি, দীপাবলী দিয়ে শুরু। তারপর চলেছে একের পর এক। প্রবাসে অনেকবিধ উদযাপন কিনা ! যে দেশটিকে নিজেদের কর্মভূমি বলে আপন করে নিয়েছি সেখানে উৎসবগুলিও তো আপন করে নিয়েছি আমরা। আর কে না জানে মার্কিন মুলুক হল বিবিধের এক মহামিলন ক্ষেত্র – "a big melting pot." Halloween, Thanksgiving, Rosh Hashanah ইত্যাদি নানা উদযাপনের সামিল হই আমরা আমেরিকাবাসীরা। সামনেই আসছে প্রভু যীশুর জন্মদিন। বড়দিন। পৃথিবীজোড়া উদযাপন। বিশ্বায়নের এই একটা ফল বেশ স্পষ্ট ভাবে চোখে পড়ছে। উৎসবপালনে বিশ্বজোড়া ঐক্যতান। বড়দিনের পরেই বর্ষবিদায়। ৩১ শে ডিসেম্বরের

হুল্লোড়। হৈহৈ করে এসে পড়বে নতুন বছর। বছর আসে। বছর যায়। সময়ের প্রবাহ অনন্ত। তাকে মাস বছরের এককে বেঁধে ফেলেছে মানুষ নিজেদের সুবিধের জন্যে। কিন্তু তাও ওই "নতুন" শব্দটারই একটা আকর্ষণ আছে। যেন দৈনন্দিনের থেকে আলাদা একটা কিছু। নতুন বছরের নতুন ভাবনার সঙ্গে পরিচয় হবে। চিন্তার কোন মৌলিক উপাদান পাওয়া যাবে এমনটা আশা হয়। জীবনধারণ নয় শুধু, যেন জীবনযাপনের একটা দিশা পাওয়া যাবে আগামী বছরে। এই চিন্তায় সমুখপানে এগিয়ে চলা আর বর্ষবরণের উচ্ছাসে সামিল হওয়া।

আমার বেড়ে ওঠা সত্তরের দশকের শেষ আর আশির দশকের গোড়ায়। সে সময় অবসর যাপনের জন্যে আনন্দমেলা, শুকতারা, দেশ পত্রিকা, বাড়ীর ছাতে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা মারা, রেডিওতে ক্রিকেট ফুটবলের ধারাবিবরণী, অনুরোধের আসর, নাটক-এসবই ছিল। ইলেকট্রনিক্সের এমন সর্বব্যাপী রাজত্ব শুরু হয় নি তখন। কম্পিউটার এর পর্দায় অজস্র জানালা একইসঙ্গে খুলে ফেলার অবকাশ ছিল না কোন। তাই গ্রন্থের সঙ্গে ছোট্টবেলা থেকেই রচিত হয়েছে এক অবিচ্ছেদ্য গ্রন্থি। বেশীর ভাগই বাংলা বই। উপেন্দ্রকিশোর, সুকুমার রচনাসমগ্র, ঠাকুরমার ঝুলি, লীলা মজুমদার – শৈশবের দিনগুলি আনন্দে ভরে থাকত। ক্যালেন্ডারে নির্দিষ্ট উৎসব কবে শেষ সেকথা খেয়াল হত না বিশেষ। বিশ্বসাহিত্যের সঙ্গেও কেমন করে যেন যোগাযোগ তৈরী করে দিয়েছিল বাংলা ভাষাই। Twenty Thousands Leagues Under The Sea, Uncle Tom's Cabin, The Hunchback Of Notre dame – এসব অনুবাদে পড়েছি স্কুলে থাকতেই। পরবর্তীকালেও অনুবাদেই পড়েছি বিশ্বসাহিত্যের নানা মণিমুক্তো। তবে সেসব ইংরাজী অনুবাদ। সেই অপরিণত পাঠকমন নিয়ে মনে হত ইংরাজী অনুবাদটিই বেশী মূলানুগ। এ ধারণার আদৌ কোন ভিত্তি আছে কিনা তা ভেবে দেখার মতো একটি বিষয়। ভবিষ্যতের জন্যে তোলা রইল তা।

Rachel Carson এর লেখায় পড়ি – "If you write what you yourself sincerely think and feel are interested in, you will interest other people."

ভাষা যাই হোক না কেন পাঠকমনকে যা ধরে রাখতো তা হল সংযোগ। পাঠকের সঙ্গে লেখকের অন্তর্লীন এক সংলাপ তৈরী হলে তবেই সে পাঠ সার্থক। তবে সব লেখা যে সবরকমের পাঠকের সঙ্গে সেতু তৈরী করবে এর কোন মানে নেই। নানা স্বাদের লেখা আর ভিন্ন রুচির পাঠক। এই নিয়েই বই লেখা, প্রকাশনা আর পাঠের এক বর্ণবৈচিত্র্যময় জগৎ। আসলে লেখা যেমনই হোক সেখানে সততা জরুরী। দুছত্র লেখাও পাঠককে স্পর্শ করে যায় যদি সে লেখার মধ্যে আন্তরিকতা থাকে, নিছক তাক লাগিয়ে দেওয়ার চেষ্টা না থেকে। সৎ ও আন্তরিক শিল্পসৃষ্টির একটা সর্বজনীন আবেদন আছে।

দিনে দিনে আমরা বড় দূরে সরে যাচ্ছি পরস্পরের কাছ থেকে। বিচ্ছিন্ন বিন্দুর মতো অবস্থান। হাতের মুঠোয় যোগাযোগ মাধ্যম এখন। খুব সহজে একে অন্যের কাছে পৌঁছে যাওয়া যায়। তাই জনেই কি তৈরী হচ্ছে ভাবজগতের এই সীমাহীন দূরত্ব ? কাব্যে সাহিত্যে তারই প্রকাশ দেখছি নাকি ? লেখক পাঠক অন্তরঙ্গ কথোপকথনের জায়গাটি যেন হারিয়ে গেছে আজ।

শিকাগোর নভেম্বর। দিনের আলো বড় স্বল্পস্থায়ী। রোদের উষ্ণতা ক্রমেই কমে আসছে। সপ্তাহান্তের অবকাশে তাও সেই অল্প উষ্ণতার ছোঁয়ার আশায় বাড়ীর মধ্যে সেই জায়গাটি খুঁজে নেওয়া যেখানে জানালার কাচের গায়ে জমাট উত্তাপ। সেই জায়গাটিতে নানাবিধ শারদীয়া নিয়ে বসেছি। কিন্তু সবকিছু ভুলে ঠিক মজে যেতে পারছি না কোন গল্প বা উপন্যাসে। অহরহ শৈত্যপ্রবাহের কাছাকাছি থাকা হৃদয় অন্তরঙ্গ পাঠ অভিজ্ঞতার ওমে সেঁকে নেওয়া যাচ্ছে না। কোথাও একটা পরিবর্তন হয়েছে বেশ বুঝতে পারছি। পরিবর্তন তো হবেই। রূপান্তর জীবনের ধর্ম। মাটিতে স্থির পড়ে থাকা পাথরের টুকরো আর তার গায়ে জমে থাকা শ্যাওলার কথা আমরা সবাই জানি। কিন্তু মনোযোগ আকর্ষণ করার মতো কোন লেখাই খুঁজে না পেয়ে বড় হতাশ হলাম। এই পরিবর্তনে কোন ধনাত্মক কিছু নেই। হয় পাঠক হিসেবে আমি

আমার পরিশীলিত মনটি খুইয়েছি, অথবা মননশীল পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করার মতো রচনা বাংলায় এখন দুর্লভ। ধরে নিই প্রথম যুক্তিটাই যথার্থ। মনে দ্বন্দ্ব লাগে। কিছুদিন আগেই পড়লাম প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর "মহাস্থবির জাতক।" পাতায় পাতায় হারিয়ে যাওয়া, ডুবে যাওয়া, স্থানকাল ভুলে মগ্ন হওয়া। এক মহান চিত্রকথা – স্মৃতিকথা, ইতিহাস আর কাহিনির অপূর্ব সমন্বয়। বিশ শতকের একটা সময়ের বর্ণময় চিত্রাবলী। কিন্তু চার পর্বের অখণ্ড "মহাস্থবির জাতক" শেষ হয়ে গেলেও মনের মণিকোঠায় জ্বলজ্বল করে গ্রন্থজুড়ে ছড়িয়ে থাকা রত্নরাজি।

"বাল্যকাল অতি সুখের কাল। কে বললে, বাল্যকাল অতি সুখের কাল ? অধিকাংশ লোকেরই বাল্যকাল অতি দুঃখেই কাটে। সেই দুঃখের গভীরতা বোঝবার ক্ষমতা বালকের প্রায়ই থাকে না, তাই পরিণত পাটোয়ারী মস্তিষ্কের প্রবীণরা বেপরোয়া বলে দেন, বাল্যকাল অতি সুখের কাল।"

"ইতিমধ্যে পাতে ডাল আর তরকারি এসে পড়ল। সে রান্নার স্বাদ আজও আমার রসনায় লেগে আছে। ডাল নাম যে ময়লা জল পাতে এসে পড়ল তা দেখতেই ময়লা কিন্তু তাতে ভাতে রঙ ধরল না। তার বর্ণ, গন্ধ ও স্বাদে কিছুতেই বোঝা গেল না সেটা কি ডাল। তরকারি নাম যে পদার্থটি দেওয়া হল তার সম্বন্ধেও ওই কথাই বলা চলে। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় এই যে ডাল কিংবা তরকারিতে কোনো স্বাদ নেই। বেসুরো গান সকলেই গায়, কিন্তু প্রত্যেক পর্দায় বেসুরো আওয়াজ বের করা যার তার কর্ম নয়। তেমনি বিস্বাদ রান্না রাঁধা যায়, কিন্তু একেবারে স্বাদহীন রান্না এর পরিবার কোথাও খাই নি।"

এক সকালে পড়শী ও প্রিয় বান্ধবীর ফোন পেলাম। "রঞ্জিতা, তোমার বাড়ী আজ বিকেলে যাব। গল্পের বই আনতে।" জিজ্ঞাসা করলাম, "কি বই নেবে ? বাংলা না ইংরাজি ?" একটু থেমে সে উত্তর দিল "ইংরাজি। বাংলা গল্পের বইয়ের সঙ্গে আজকাল আর তেমন একাত্মতা বোধ করি না।" কেন আমাদের মতো সাধারণ, নিষ্ঠাবান পাঠক আর বাংলা গল্প, উপন্যাসে ভাললাগা খুঁজে পাচ্ছেন না সেটা ভাবার বিষয়। লেখালেখি হচ্ছে অনেক। বিশ্লেষণ চলছে। দেখা যাক !

আপাততঃ অর্থনীতির একটি সহজ সূত্র মনে পড়ে যাচ্ছে। পর্যাপ্ত যোগান তার নিজস্ব চাহিদা তৈরী করে। যোগান আছে হয়তো। মাঝেমাঝে সন্দেহ হয় এই প্রচারসর্বস্বতার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আমরা বড় বিভ্রান্ত। চারপাশে অজস্র নটেগাছ। আলোর জন্যে বনস্পতির লড়াই কঠিন। জ্বলে উঠুক হাজার প্রদীপ। ভাষাগাছ সেই আলো থেকে আহরণ করুক প্রাণরস। বাংলা ভাষার অরণ্যে ইংরাজী ২০২৩ এ লক্ষ মাণিক ঝলসে উঠুক।

রঞ্জিতা চট্টোপাধ্যায়

# সূচীপত্র বাতায়ন

## গল্প

অমর মিত্র

**কার্নিস, বেড়াল ও লম্বা ছায়া** 9

রমা সিনহা বড়াল

**জেমস ওয়েব টেলিস্কোপ** 16

সুজয় দত্ত

**উপহার** 18

জয়তী রায়

**খোঁজ** 25

ইন্দিরা চন্দ

**লাট্টু** 30

কৃষ্ণা গুপ্ত

**কনকলতা** 32

রমা জোয়ারদার

**প্যান্ডেলের ঠাকমা** 34

নবনীতা বসু হক

**আধুনিক** 38


## কবিতা

উদ্দালক ভরদ্বাজ

**ফিরিয়ে তুমি** 41

সুদীপ্তা চট্টোপাধ্যায়

**দহনের ছাই ...** 42

সঞ্জয় চক্রবর্তী

**আখরবাসা** 43

সৌমিত্র চক্রবর্তী

**দীনেশ স্যার,**
**আপনি বেঁচে আছেন ?** 44

মানস ঘোষ

**পাসওয়ার্ডের নাম** 45

বালার্ক ব্যানার্জী

**২০২৩ দেশে ফেরা** 46


## বিশেষ রচনা

সুপর্ণা চ্যাটার্জী

**এক সাধারণ সত্যের খোঁজে** 47

দেবীপ্রিয়া রায়

**ধর্ম নিয়ে** 49

ইন্দ্রাণী দত্ত

**হাউ টু টেল আ শাটারড স্টোরি** 53

সিদ্ধার্থ দে

**শাক সবজির অবমাননা** 60

মলয় ব্যানার্জী

**নারীদিবস** 63

শকুন্তলা চৌধুরী

**পুতুলখেলার ইতিকথা** 65

নূপুর রায়চৌধুরী

**অনিশ্চয়তার ঘেরাটোপে**

**বিজ্ঞানপ্রবর** 71.

**স্মরণে শ্রদ্ধা**

সৌমিক বসু

**ফুটবল সম্রাট** 81

**বিশেষ আকর্ষণ**

সঞ্জয় চক্রবর্তী

**জানলার পাশে কফি – কলকাতা বইমেলা ২০২৩** 85

গল্প

# অমর মিত্র

## কার্নিস, বেড়াল ও লম্বা ছায়া

এই যে সে বাস টার্মিনাসে এসে ঘোরাফেরা করছে। তাকে যেতে হবে সেই বাড়িটায় যে বাড়িতে এ জীবনের অনেক বছর কেটেছিল। বাড়িটার কথা তার বেশ মনে আছে। বড় রাস্তা থেকে সমান্তরাল আর একটা বড় রাস্তায় যাওয়ার লিঙ্ক রোড ধরে এগিয়ে ডানদিকে ঘুরে অনেকটা গিয়ে আবার ডানদিকে ...। দোতলা। তার একটা চিলেকোঠা ছিলো। মনে মনে সে চিনতে পারছে বাড়িটাকে। প্রাচীরের গায়ে একটা শ্বেতপাথরের ফলক – মাতৃস্মৃতি। কার মা, পিতা না পিতামহর নাকি প্রপিতামহর? নাকি যাদের কাছ থেকে কেনা হয়েছিল তাদের কারওর মা। নাকি তার নিজের মা? মুখখানি খুব ভালোলাগত তার। দেখলে মন ভরে যেত। কিন্তু শুনেছিল ঠাকুমা পছন্দ করত না। বাবাও না। রাত্তিরে কোলের কাছে নিয়ে এ কথা মা একদিন তাকে বলে ফেলেছিল।

এই যে সে। সে ট্রেনে করে এসে নেমেছে হাওড়ায়। থাকে অনেক দূরে। জায়গাটায় ছোট পাহাড় আছে, জঙ্গল আগে ছিল, এখন প্রায় মুছে গেছে। রোদের খুব তেজ। মনে হয় গরম দুধের মতো। সে রোদের দিকে তাকিয়ে থাকত জানলা খুলে। গরম হাওয়া এসে ঢুকত ঘরে। তখন ছুটে আসত একজন। ওফ! তুমি জানলা খুলেছ! মরে যাবে যে। বাড়িটা এমনিতেই ফার্নেস হয়ে উঠেছে।

সে কোনও কথা বলত না। কিন্তু রোদের দিকে তাকিয়ে তার নেশা হয়ে যেত। জানালা আবার খুলে দিত বউ চলে গেলে। বউ-ই তো হবে। নাকি অন্য কেউ? চলে গিয়েছিল না একজনের সঙ্গে? তোমার সঙ্গে থাকা যায় না। ফিরেও এসেছিল সেই একজনকে সঙ্গে নিয়ে।

সে একটা বাস খুঁজছে। বাসটায় উঠে চলে যাবে তার বাড়িটার কাছাকাছি। তার মনে আছে তেমন যেতে পারলে, মাতৃস্মৃতি বাড়িটা তাকে টানছে অনেকদিন ধরে। জানালা খুলে ঠিক দুপুরের শহর দেখতে দেখতে, ঘন রোদে ছাওয়া রাস্তা, দূরের মাঠ, বাড়িগুলোর মুখ, রবীন্দ্রভবনের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা রবীন্দ্রনাথ দেখতে দেখতে তার নিজের মনে হত রোদে বেরিয়ে যায়। একদিন বেরিয়ে হাঁটতেও আরম্ভ করেছিল। তার বউ, নাকি আর কেউ তা জানতে পেরে রিকশা নিয়ে মুখে নাকে কাপড় ঢেকে বেরিয়ে পড়েছিল। তারপর তাকে ধরতে চষে ফেলেছিল সমস্ত গঞ্জ-শহর। সে তখন কালেক্টরের বাংলোর পাশে রোদের ভিতর ঘুমিয়ে থাকা মাঠের ভিতর। রোদে নির্জন নিঝুম মাঠকে ঘুমোতে দেখে তার খুব লোভ হয়েছিল ঘুমিয়ে পড়ে। মাঠের ধারে শিরিস গাছের নীচে মস্ত একটা ছায়া ছিল। ছায়ায় বসে সে রোদ দেখছিল। জিভ বাড়িয়ে স্বাদ নিচ্ছিল যেন গরম দুধের। সেই গরম দুধ একটু একটু করে চুমুক দিতে দিতে দোতলা বাড়িটার কথা মনে পড়েছিল। সেই সময় তার বউ ছুটে এসেছিল, সঙ্গে আর একটা লোক। তাদের কারওর নাম তার মনে নেই। তপতী আর শুভেন্দু? জানি না। অরুণিমা আর মহীতোষ ? জানি না। তাহলে কি মাধুরী আর মহত্তম? জানি না, জানি না, আমার মনে নেই। তাহলে কি উত্তম-সুচিত্রা? আজ দুজনার দুটি পথ গেছে দুই দিকে বেঁকে? গানটা এই রকম। তুমি যে আমার, ওগো তুমি যে আমার। ধূপের ধোঁয়া উড়ছে। তাও জানি না, তাহলে তারা কারা? তাদের তো নামে চিনতে হবে। মনে পড়ছে না।

মনে করো, মনে করো।

ধরতে পারছি না।

আচ্ছা তারা কি উত্তম-সুপ্রিয়া?

সে চুপ করে থাকল।

অনিমেষ আর শ্রাবণী?

ঘুরছিল সে বাস টার্মিনাসে। হাওড়ায় যারা ট্রেন থেকে নামে তারা এখান থেকে বাসে করে যে যার বাড়িতে চলে যায়। ট্রেনে চেপে সবাই বাড়ি আসে। সবার বাড়ি আছে গঙ্গার ওপারের শহরে কোথাও না কোথাও। আর হাওড়া থেকে ট্রেনে যারা চাপে তারা সবাই সেই পাহাড়ি এলাকায় চলে যায়। সেখানে মাটির নীচে কয়লা। দূরে দূরে পুকুর কেটে তার ভিতর থেকে কাঁচা কয়লা বের করে গোরুর গাড়ি করে চালান দেয় সমস্ত রাত ধরে। মাঝে মধ্যে ট্রাকও আসে।।

কী হয়েছিল সেদিন ?

মনে নেই আমার, শুধু মনে পড়েছিল একটা শহরের কথা, শহরটা থেকে এদিকে আসতে হলে একটা নদী পেরোতে হয়। নদীর উপর মস্ত ব্রিজ। নদীর জলে নৌকা, লঞ্চ, জল-পুলিশের স্পিড বোট। উপরের আকাশে হালকা মেঘ। নদীর এপার থেকে ওপারের কারখানার চিমনি, ইমারতের পর ইমারত, নদীর পাড়ে পুরোনো শিব মন্দির, লম্বা বাঁধানো ঘাট দেখা যায়। এপারটাও ওইরকম। শ্মশান আছে পরপর। শ্মশানে ধোঁয়া উড়ত আগে খুব। মাংসপোড়ার গন্ধ ভেসে থাকত বাতাসে। আমি আমার বাবাকে নিয়ে গিয়েছিলাম মনে হয়। সে কত দিন আগে!

ট্রেনে করে হাওড়া আসার কথা তখন কেউ একজন বলে দিয়েছিল। ওই রকম শহর বলতে কলকাতা। সে কলকাতায় ঢুকবে। তারপর চলে যাবে সেই বাড়িটার কাছে যা কারও না কারও মায়ের স্মৃতি নিয়ে দাঁড়িয়ে।

সে একটা বাসে উঠে পড়ল। এই শহরে এখন বেলা পড়ে যাচ্ছে। যখন সে ট্রেনে উঠে বসেছিল তখন বেলা দুপুর। তারপর কত সময় কেটে গেছে। কতজন কত স্টেশনে উঠেছে, কত স্টেশনে নেমে গেছে। সে শুধু ভাবছিল এই বুঝি পৌঁছে গেল তার উদ্দিষ্ট জায়গায়। তার সামনে একটি বছর পঁচিশের সুন্দরী কন্যা বসেছিল, তার সিঁথিতে মেটে সিঁদুর উঠেছে সদ্য। তার পাশে বসেছিল এক যুবক। যুবকের কাঁধে মাথা রেখে সমস্ত পথ ট্রেনে ঘুমিয়ে এল। মুখখানি কী সুন্দর! সর্ব অঙ্গে ঝলমল করছিল সে। তার হাত ভর্তি রঙিন কাচের চুড়ি। মেহেন্দিতে রাঙানো হাতের পাতা। থুতনিতে খুব সুক্ষ্ম একটি তিল। ট্রেন যখন প্রায় পৌঁছে গেল সে চোখ মেলল। তার চোখের সামনে যেন আলো ফুটে উঠল। আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে গেল তার। মনে হল সে ছায়ার ভিতর বসে আলোর দিকে চেয়ে আছে।

ছিলও তো তাই। তারা তাকে দেখতে পেয়েছিল। রিকশা থেকে নেমে হেঁটে আসছিল ছাতা মাথায়। আগে আসছিল পুরুষ। তার পিছনে নারী। সে টের পেয়েছিল তাকেই নিতে আসছে। ছায়ার ভিতর থেকে লাফ দিয়ে সে রৌদ্রে নেমেছিল। ফুটন্ত ঘন দুধের মতো রৌদ্রের ভিতর দিয়ে দৌড়াতে দৌড়াতে উধাও হয়ে গিয়েছিল রেল স্টেশনের দিকে।

কোথায় যাবেন?

সে মাথা নেড়েছিল, ঠিক জানে না, তবে বাড়িটার নাম মাতৃস্মৃতি।

বাস কন্ডাক্টর বলে, এটা যাবে নাগেরবাজার।

সে বলেছিল, ওখানেই হয়তো।

কন্ডাক্টর বলেছিল, উঠে পড়ুন।

তারপর বাস চলেছে। বিকেল ফুরিয়ে আসছে। ঘরে ফেরার সময় এটি। সকলেই ফিরছে। পাখপাখালি থেকে মানুষজন। সে মনে করে অন্ধকার হওয়ার আগে পৌঁছতে পারলে হতো। কিন্তু তা হয়নি। কোনওদিন হবে না। বাস ছাড়তে ছাড়তেই জগৎ অন্ধকার হয়ে এল। গঙ্গা যখন পার হয় তখনও নয়, পার হয়ে এসে এপারের শহর ছুঁতেই পরপর গাড়ির সারিতে দাঁড়িয়ে বিকেল চলে গেল। আলো জ্বলে উঠল পথে।।

তাকে যেতে হবে দোতলা বাড়িটায়। সেই বাড়ি ছেড়ে তারা চলে গিয়েছিল ওই ঘন রোদ্দুরের দেশে, পাহাড়ি পথে। কবে গেল মনে পড়ে না। কার সঙ্গে গেল, মনে পড়ে না । কিন্তু মনে পড়ে এই শহরের সেই বড় রাস্তা। সেখান থেকে লিঙ্ক রোড ধরে ভিতরে ঢুকে বাড়ির পর বাড়ি। গায়ে গায়ে লাগানো। লোহার গেট খুলে এক প্রশস্ত উঠোন। সবটাই বাঁধানো, রোদের দিনে কী গরম হয়ে উঠত। বর্ষার দিনে পিছল। বারান্দায় বসে আছে এক বুড়ো। পাশের বাড়ির কার্নিশে একটা বেড়াল। উঠোনের প্রান্তে প্রাচীরের গায়ে শুয়ে দুটো পথের কুকুর। পড়েই থাকত। ঘুম ভাঙলে গেটের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে যেত। ও পাড়ায় কত কুকুর। সমস্ত রাত তারা পথে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে থাকে।

সে কন্ডাক্টরকে ভাড়া দিতে দিতে বলল, আমাকে নামিয়ে দিয়ো।।

দেব, বলবেন স্টপেজ এলে।

সে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখতে লাগল সন্ধ্যার শহর। কোথাও কোথাও অন্ধকার নিজেকে বাঁচিয়ে রেখেছে। সেই যে বাড়িটা, একবার ইলেকট্রিক বিল না মেটানোয় অনেকদিন অন্ধকার হয়ে পড়ে ছিল। হেরিকেন জ্বলত, কেরোসিনের টেমি জ্বলত। দোতলার বারান্দা, সিঁড়ি অন্ধকার। সেই অন্ধকারে খুব লম্বা একজনকে সিঁড়ি দিয়ে নেমে যেতে দেখেছিল সে। খুব ভয় পেয়েছিল। তখন তার ষোলো-সতেরো। মা বলেছিল, একজন আছেন। তিনি ঘোরাফেরা করেন। মা তাঁর নিঃশ্বাস, তাঁর পায়ের শব্দ টের পেয়েছে কতদিন। তবে তিনি নাকি কারও ক্ষতি করেন না। বাড়িরই তো একজন ছিলেন।

বাড়ির একজন, কে?

মা বলেছিল, তার বাবার কাকা। মায়ের খুড়শ্বশুর। তিনি সুইসাইড করেছিলেন উঠোনের কোণে দাঁড়ানো একটা আমগাছের ডাল থেকে ঝুলে। মা তাঁকে নেমে যেতে দেখেছিল মধ্যরাতে। এখনও তিনি উপর থেকে নীচে নেমেই যান। তাঁর আত্মহত্যার পরে আমগাছটিকে আর রাখা হয়নি। তিনি নেমেই যান। আমগাছটিকে খুঁজে না পেয়ে আবার উঠে আসেন। আবার পরদিন নেমে যান।

তার মনে হচ্ছিল এসে গেল হয়তো। খুব কাছাকাছি চলে এসেছে। গাড়ি দাঁড়িয়ে পড়েছে সিগন্যালে। বাইরের এক রেস্তোঁরা থেকে যে গন্ধটি তার নাকে এসে লাগবে, তা খুব চেনা। কত পুরোনো। বাবার হাত ধরে ওই গন্ধওয়ালা রেস্তোঁরায় এসেছে কয়েকবার। তারা দুজনে মোগলাই পরটা, কিংবা ফিসফ্রাই খেয়ে ফিরেছে। মা হেসে বলত, তোর গায়ে কিসের গন্ধরে বুবুন ?

সেই সেই গন্ধ। বাড়িটা রেখে, ওই গন্ধ, রাস্তা, শহর রেখে কবে যে ভীষণ রোদের গঞ্জে গিয়ে কার হাতে পড়ল সে ? আবার ফিরে এসেছে। বাড়িটায় বেশ হেরিকেন জ্বলতে থাকবে। অন্ধকারে সেই লোকটা নেমে যাবে। তার সঙ্গে সঙ্গে সে নিজেও। বাবা নাকি রেস খেলে সব খুইয়ে ছিল। চিলেকোঠার ঘরে তাস খেলত বাবারা। জুয়া। মা রাগ করত। কিন্তু মায়ের কিছু করার ছিল না। ধবধবে শাদা পাঞ্জাবি, পায়জামা পরে, গায়ে ভুরভুরে এসেন্স ছড়িয়ে, জ্বলন্ত সিগারেট হাতে বাবা তাস খেলত। প্রায় সবদিন হারত। বাবা না হারলে বন্ধু আর দু'জন আসবে না, তাই বাবাকে হারতেই হতো। খেলাটা এত আনন্দের যে হারটা কোনো দুঃখেরই না, বাবা বলত। খেলাটাই আসল, হার কিছু না।

সে ভাবছিল নেমে যাবে কি না। কিন্তু নাকে আসা গন্ধটা হঠাৎ উধাও। তাহলে হয়তো গন্ধটা তার মনে এসেছিল। এখনো সে পৌঁছয়নি সেখানে। সে জানালা দিয়ে ভালো করে দেখল। না, চেনা লাগছে না। অথচ চেনা থাকার কথা ছিল। চেনা পথ, চেনা দোকানপাট, চেনা মানুষ। বাবা পায়চারি করছে রাস্তার মুখে। ইলেক্ট্রিক কানেকশন কেটে যাওয়ার পর জুয়ার আসর বন্ধ হল। বন্ধুরা অত অন্ধকারে অত গরমে হেরিকেনের আলোয় জুয়ো খেলতে রাজি হলো না। তখন বাবার কী অবস্থা! সন্ধের পর রাস্তায় ঘোরাঘুরি, চায়ের দোকানে বসা, শেষে চিলেকোঠার ঘরে একা। একদিন তাকে ডাকল, বুবুন খেলবি ?

মা বলেছিল, যা বুবুন।

সে বলেছিল, তোমার কষ্ট হবে না মা ?

মা বলেছিল, লোকটা আর পারছে না।

বাবা তাকে চিলেকোঠার ঘরে নিয়ে গিয়ে হেরিকেনের আলোর সামনে বসে বলেছিল, তুই জিতলে আমার আনন্দ হবে।

সে বলেছিল, আমি তো খেলতেই জানি না।

তোকে শিখিয়ে দিই, আগে তাসগুলো চিনে নে।

সে ছিল আশ্চর্য খেলা। তার মনে হয়েছিল বাবার জেতা উচিত। বাবা জিতলে সে আনন্দ পাবে। বাবা তাকে বুঝিয়েছিল, না ছেলের কাছে বাবা হারতেই চায়।

সে বলেছিল, না বাবা, তোমাকে জয়ী দেখতেই তো আমি চাইব।

সারাজীবন সবার কাছে হেরে ছেলের কাছে জিততে আসব কেন আমি? ছাদের উপর বসে আকাশ দেখতে দেখতে সে বাবার কথা শুনত। বাবার পরাজয়ের বৃত্তান্ত। মানুষ হারে শুধু বুদ্ধির দোষে।।

মা একদিন বলল, সবটা সত্য নয়।

কোনটা সত্য নয়?

মা বলেছিল, তোকে বলা যাবে না, সব তোকে জানতে হবে না।।

কথাগুলো অজানাই থেকে গেছে। তবে কিছু কিছু সে শুনেছিল। এক মহিলার কাছে তাকে বাবা পাঠিয়েছিল একবার টাকা আনতে। টাকা নিয়েও এসেছিল সে। কিন্তু পরেরবার গিয়ে আর তাঁকে পায়নি। সেই ফ্ল্যাট ছেড়ে তিনি চলে গিয়েছিলেন বেড়াতে। বাবা তখন জ্বরে পড়ে আছে।

মা বলেছিল, ওই জনই আমাদের সব্বোনাশ করেছে।

এসেছে যখন শহরে সে এবার সব জেনে আসবে। তার মনে হচ্ছিল উঠে পড়ে। এসে যাচ্ছে জায়গাটা। সেই যে সেই মাতৃস্মৃতির শহর। চিলে কোঠায় বসে বাবা একা তাস খেলছে মাদুরের উপর। রুহিতন, হরতন, চিড়িতন, ইস্কাবন। লাল কালো। বাবার মস্ত ছায়া দেওয়ালে স্পন্দিত হচ্ছে। ভয়ে সে একদিন জিগ্যেস করেছিল, কে মা উনি ?

ওঁর ঘরেই তো আগে তাস খেলা হত, তোর বাবা হেরে আসত, ওকে জিতিয়ে দিয়ে ওর মন পেয়ে গিয়েছিল, কোনও লোক হারতে এত ভালোবাসে!

একদিন বাবার জ্বর এল দুঃখে। জ্বর যে লেগেছিল আর ছাড়ছিল না। শেষে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হল লোকটাকে। হাসপাতালটা খুব দূরে ছিল না। ফ্রি-বেডে পড়েছিল অনেক দিন। তারপর আর যুঝতে পারল না।

সে এবার নামবে। হাসপাতালের গন্ধটা পেল। ঘন করে ওষুধের গন্ধ, ফিনাইলের গন্ধ। কত মানুষ তাদের প্রিয়জনকে হাসপাতালের ভিতর রেখে দিয়ে বাইরে অপেক্ষা করছে। অপেক্ষা করেই আছে। দিন নেই রাত নেই বসেই আছে বাইরে। হাসপাতালের মত ইমারত অসংখ্য মত্যুকে ধারণ করে কেমন ভীতিকর হয়ে উঠত মধ্যরাতে। ভিতরে ডাক্তার নার্স জেগে আছে কোনও ওয়ার্ডে। রোগীরা কেউ কেউ দু-হাত দু-পা দিয়ে ঠেকিয়ে রেখেছে মৃত্যুকে।

সে ভাবছিল নেমে পড়বে। হাসপাতাল থেকে বাড়ির পথটি তার চেনা। ওই পথেই হাঁটতে হাঁটতে মায়ের কাছে শেষ খবরটি এনেছিল। সে নামতে যাবে তো হাসপাতাল পিছনে চলে গেল ওষুধের ভারী গন্ধ নিয়ে। আবার একটি নতুন গন্ধ, নতুন চিহ্ন এলেই সে নামবে। নামবেই এবার। বাস ফাঁকা হয়ে এসেছে। সে ঘুরে বাঁ দিকে জানালা দিয়ে বাইরেটা দেখতে গিয়ে টের পায় সেই হাতে মেহেন্দি, হাত ভর্তি রঙিন চুড়ি, মেটে সিঁদুর, রঙিন সিল্কের আঁচলের নীচে ঘুমিয়ে থাকা দুটি মোহনীয় স্তন, ভারী উরু, চওড়া কোল নিয়ে যে লাবণ্যময়ী তার সঙ্গে ট্রেনে এসেছে এতদূর, সে-ও বাসে আছে। কখন উঠেছে জানে না। তার সঙ্গেই বুঝি চলেছে মাতৃস্মৃতির উদ্দেশে। সঙ্গের যুবক স্বামীটি বাসের অন্য কোথাও হয়তো। সে তাকিয়ে থাকল। চেনা মনে হচ্ছে। এইরকম শাড়ির খসখস, ভুরভুরে এসেন্সের গন্ধ, গয়না ভর্তি গা, ফুলের মালা –। আচমকা সব আলো নিভে গেল যেন। সে টের পায় তাকে সে রেখে এসেছে অন্য কোথাও। অথবা সে অন্য কারওর হাত ধরেছে। তাকে নিয়ে মাতৃস্মৃতিতে প্রবেশ করলে সব ঝলমল করে উঠেছিল।

বাস চলছিল। যুবতী বধূ উঠল। গেটের কাছে এগিয়ে গেল। কোথা থেকে যুবক স্বামীটি এসে তাকে ছুঁয়ে দাঁড়াল। স্বামী বলল, ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

জানি, বাসে উঠলেই তোমার ঘুম। রিনরিনে সোহাগী কণ্ঠস্বর বেজে উঠল।

তুমি যে সমস্ত ট্রেনে ...।

বাহ, তুমি যে বললে, তাই।

ঘুমিয়ে নিলাম, রাত জাগা হবে তো।

বধূটি বলল, পাশের বাড়ির কার্নিশের বেড়ালটাকে দেখলে ভয় করে, ও ঘরের ভিতরে নজর দেয়।

তাড়িয়ে দেব ?

তাই দিও, জানালায় এসে দাঁড়াবে না তো বুড়ো লোকটা ?

না জানালা বন্ধ রাখব।

বধূ বলল, 'ইস! জানালা দিয়ে কী সুন্দর চাঁদের আলো আসে।'

আচ্ছা বুড়োকে তাড়িয়ে দেব। স্বামী বলল।

আর সেই যে একটা লম্বা লোক নেমে আসে শুনেছি, আমার কী ভয় করে ? বধূ বলল।

ভয়ের কী আছে ?

আম গাছটা কোথায় ছিল, এই জানালার ধারে নয়তো?

না, তা হবে কেন ?

এই আমার ভয় করছে, কী রকম অন্ধকার।

অন্ধকারে আমাদের অভ্যেস আছে। স্বামী মানুষটি বলল।

বধূ তাকে জড়িয়ে ধরে বলল, কবে আলো আসবে ?

অন্ধকার আমাদের ভালো লাগে। সে বউ-এর বুকে মুখ গুঁজল, বিনবিন করে বলল, এই তাস খেলবে, তিন পাত্তি, শিখিয়ে দেব।

আলো না এলে আমি তাস খেলব না।

আলো এল। ডুম জ্বলতে লাগল বারান্দায়, ঘরে। বউকে ডাকল সে, এসো তাস খেলব, ভয় নেই তুমি জিতবে।

না, তোমার কাছে আমি হারব।

না তুমি জিতবে বউসোনা।

কেন, তুমি কি ইচ্ছে করে হারবে?

স্বামী বলল, আমার হারতে ভালো লাগে।

নাকি জিততে পার না তাই ? তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল রমণী কণ্ঠস্বর।

তখন কন্ডাক্টর তার পিঠে হাত রেখেছে, কোথায় নামবেন ?

এসে গেছে? সে চমকে জেগে উঠল। সমস্ত বাস ফাঁকা।

হ্যাঁ শেষ স্টপেজ, এ বাস আর যাবে না।

তারা কোথায় নামল ?

কারা ? কন্ডাক্টর অবাক, সঙ্গে কেউ ছিল ?

ছিল তো, বাবা ছিল, মা ছিল, বউসোনা ছিল, কার্নিশের বেড়াল, সিঁড়িতে বসে থাকা বুড়ো, দোতলা থেকে নেমে আসা লম্বা লোক, উঠোনের কুকুর, তালা বন্ধ চিলেকোঠা, দোতলার শরিকদের ছেলের বারান্দা থেকে ছরছর করে নেমে আসা পেচ্ছাপ –! মামলায় হেরে তাদের দোতলা থেকে একতলায় নেমে আসতে হয়েছিল। বাতাসে পেচ্ছাপের ছিটে ঘরের ভিতর, বিছানায় এসে পড়ত।।

সে ফিরেছিল সেই রোদে-পোড়া রোদে-সেঁকা গঞ্জে। তার বউ বলল, আবার গিয়েছিলে তো ?

হু, কী সুন্দর পড়ে আছে শহরটা, ঠিক সেই রকম, গঙ্গা নদীও রয়েছে।

লজ্জা করে না যেতে, মেরে বের করে দিয়েছিল, তোমার বাবা সব বন্ধক দিয়ে গিয়েছিল জুয়োয়।

সে চুপ করে থাকল।

বউ বলল, সব জাল দলিল, কিন্তু কিছু করতে পারলে?

না হেরে গেলাম।

হারতে তো ভালোবাস।

তাই তো, আনন্দ আছে, সবাই খুশি হয়।

তবে গিয়েছিলে কেন, খুঁজে পেয়েছিলে?

সে মাথা নাড়তে বউ বলল, পাবে না তো জানি, আমি আর অঞ্জন কত খুঁজলাম তোমাকে, থানায় গিয়েছিলাম, থানা বলল, নিজে নিজেই ফিরে আসবে, পুলিশ সব জানে, এলে তো! অঞ্জন চাইছিল তুমি যেন হারিয়ে যাও।

সে বলল, তাস খেলবে ?

তুমি তো হারবে জানি।

তাতে খুশি হবে না তুমি বউসোনা?

বউ বলল ওসব বলবে না তো, অঞ্জন রাগ করে, যদি ও আমাকে নিয়ে চলে যায়, তখন তুমি কী করবে ?

গিয়েছিলে তো।

হ্যাঁ, পরে মনে হল তুমি একা পড়ে আছ, অঞ্জনই আমাকে ফেরত নিয়ে এল।

সে জিগ্যেস করল, তোমার মনে পড়ে না ?

কী, সেই কার্নিশ, বেড়াল, বুড়ো, লম্বা ছায়া ?

হ্যাঁ, সব ভুলে গেছ?

হ্যাঁ, ভুলে গেছি, কিন্তু রাত হলেই মনে পড়ে, বলে তার বউ চোখ মুছতে লাগল আঁচলে। অঞ্জন তার বিয়ের আগের চেনা। অঞ্জন নিয়ে এল তাদের এই শহরে। বিনিময়ে সে অঞ্জনের সঙ্গে ঘুমোতে গেল। প্রথম প্রথম আড়ালে, লুকিয়ে, পরে এই লোকটাকে এই ঘরে শুইয়ে দিয়ে, মশারি গুঁজে দিয়ে। অঞ্জনকে শর্ত দেওয়া আছে, এই লোকটাকে রাখতে হবে সঙ্গে। এই লোকটা হারতে হারতে একেবারে হারিয়ে গেছে কোথায় যেন। একে সে ছাড়তে পারবে না।

সে ডাকল, বউসোনা ?

বউ আঁচল নামাল মুখ থেকে, বলল, ও ভাবে ডাকবে না, অঞ্জন পছন্দ করে না।

সে বলল, যাও তুমি ও ঘরে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ো, তোমাকে ছাড়া ওই অঞ্জন ঘোমাতে পারে না।।

তাহলে যাই।

যাও, ঘুম ভাঙলে এসো, তাস খেলব, গ্যাম্বলিং হবে।

কী হবে খেলে, তুমি তো হারবে।

সে বলল, না, তোমাকে জিতে নেব, নেবই বউসোনা।

তারপর ? বউ ঝুঁকে পড়ল তার দিকে।

পুরোনো বাড়ি, কার্নিশ, কালো বেড়াল, বুড়ো লোক, লম্বা ছায়ার ভিতরে আমরা, আমরা .... আমরা। বলতে বলতে সে জড়িয়ে ধরল বউকে।

রমা সিনহা বড়াল

# জেমস ওয়েব টেলিস্কোপ

আজ শুক্রবার ২৬-৮-২২, বিকাল পাঁচটা। নাসার তৈরি জেমস ওয়েব টেলিস্কোপ সম্বন্ধে পড়াশোনা করছিলাম। পড়তে পড়তেই মানসিক ভ্রমণ করতে পৌঁছে গেলাম মহাকাশের কৃষ্ণগহ্বরের কাছে। হঠাৎই এক প্রবল আকর্ষণে আমার মহাকাশ যান প্রচন্ড গতিতে ঢুকে পড়লো কৃষ্ণ গহ্বরের মধ্যে। জেমস ওয়েব টেলিস্কোপ তার সবকটি আয়না মেলে ধরলো। চারপাশের নিকষ কালো অন্ধকারের মধ্য দিয়ে তরঙ্গায়িত ওঁম কার ধ্বনি ভেসে এলো। পথ দেখিয়ে নিয়ে চললো কয়েক শত কোটি আলোকবর্ষ দূরের অচেনা অজানা গ্রহের পানে। বহু যুগের ওপার থেকে ক্ষীণ বেতার তরঙ্গ ভেসে এলো। যেন বলতে চাইলো "সুস্বাগতম, তোমায়, হে পৃথিবীর মানুষ"। সারা শরীরে শিহরণ খেলে গেল। মনটা আনন্দে ভরে গেল। মনকে জিজ্ঞেস করলাম, "এ কোথায় এসে পৌঁছলাম ?" প্রচন্ড বেগে কৃষ্ণগহ্বরের গহ্বর থেকে বেরিয়ে মহাশূন্যে এসে পড়ল আমার যান।

টেলিস্কোপ-এর আয়নাতে শত কোটি আলোকবর্ষ দূরের নক্ষত্র পুঞ্জ তাদের বিচ্ছুরিত আলোকরাশি সহ প্রতিভাত হল। না না বর্ণের আলোকচ্ছটায় চারিদিক বর্ণময় হয়ে উঠেছে। মহাজাগতিক এই অপূর্ব দৃশ্য আমাকে বাক্যহারা করলো। অনেক দূর থেকে একটা ক্ষীণ তরঙ্গ ভেসে এলো। সুপার কম্পিউটার তা বেতার তরঙ্গে অনুবাদ করে জানাল আমরা পৃথিবীর মতো এক গ্রহের কাছাকাছি এসে পড়েছি। অদম্য ইচ্ছা জাগলো সেই গ্রহকে চাক্ষুষ করার জন্য।

কিন্তু এতো আমাদের পৃথিবীর এই মহাদেশ থেকে অন্য মহাদেশে বেড়াতে যাওয়ার মতো নয়, মহাশূন্যের মহাকাশে, অন্য সৌরজগতে, পৃথিবীর থেকে কয়েক শত আলোকবর্ষ দূরের এক গ্রহের হাতছানি। আকাশ যানের জানলার মধ্যে দিয়েই সমুদ্র নীল এক গ্রহ আবার এক গ্যাস তরঙ্গ পাঠালো। আমার অনুবাদক সুপার কম্পিউটার জানালো ওই গ্রহ আমাকে সেখানে যেতে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। ওয়েব টেলিস্কোপ-এর আয়নাতে দেখতে পেলাম এক নীলাভ আলো এই গ্রহকে মায়াবী করে তুলেছে। এ যেন আমাদের পৃথিবীর যমজ ভাই। মহাজাগতিক এই রহস্য আমাকে উৎসুক করে তুললো সেখানে নামার জন্য। আবার তরঙ্গ ভেসে এল, আমার মনের ভাষা যেন সে পড়ে ফেলেছে। বললো আমরা তোমাদের চেয়ে কয়েক শত কোটি বছর এগিয়ে আছি। আমাদের দেখলে তোমরা তোমাদের ভবিষ্যৎ দেখতে পাবে। তোমাদের পৃথিবীর ভাষায় আমার নাম "এইচ আর আই পি ৬৫৪২৬ বি" গ্রহ। কিন্তু আমাদের গ্রহের ভাষায় আমি হলাম "বিশ্বরূপ দর্শন"। যার মধ্য দিয়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড দর্শন করা যায়।

এই সৌরজগতে অগুনতি নক্ষত্র ও আরো কিছু গ্রহ আছে। তোমাদের মতো আমাদের সৌরজগতে দুজন সৌর রক্ষক অর্থাৎ সূর্য দেব। যিনি এই সৌরমন্ডল কে বাঁচিয়ে রেখেছেন। একজন দীর্ঘ দিন ধরে জ্বলে এখন খানিক স্তিমিত। কিছুদিন পর সে "বেতার লোবের" মতো ফসিল হয়ে যাবে। তার থেকে জন্ম নিয়েছে দ্বিতীয় রবি। আমাদের এখানে তার নাম "প্রজ্জ্বলিত কিরণ"। এখান থেকে বহু যোজন দূরে সে আছে কিন্তু অসম্ভব তার তেজ। সে হলো বিভিন্ন গ্যাসের জ্বলন্ত পিন্ড। এই সৌরমন্ডলের চারিদিক দুরন্ত গতিতে প্রদক্ষিণ করছে। এই গ্যাসের প্রচন্ড চাপে সৃষ্টি হল তরঙ্গ। মহাজাগতিক চৌম্বক ও বৈদ্যুতিক গতির ফলে সৃষ্টি হচ্ছে বেতার তরঙ্গ। তার আলোয় নক্ষত্র পুঞ্জ, ও গ্রহ আলোকিত হয়ে উঠছে। কিন্তু এখনও কোথাও কোন প্রাণের স্পন্দন পেলাম না। বুঝতে পারছিলাম না এই গ্রহের অধিবাসীরা কেমন? আবার বেতার তরঙ্গ জানালো তারা পৃথিবীর প্রাণীদের আত্মার আত্মীয়। সারা শরীরে কাঁটা দিয়ে উঠলো। মনে হল আমার পূর্ব পুরুষদের এখানে দেখতে পাবো।

অবশেষে আমার আকাশযান নীলগ্রহের ভূমি স্পর্শ করলো। এ এক অদ্ভুত সৌরমন্ডল। গ্রহ ঘিরে কোন বায়ু মন্ডল নেই। চারিদিকে কিছু অশারীরিক, কায়াহীন তরঙ্গ ভেসে বেড়াচ্ছে। তারাই সংবাদ আদান প্রদান করছে। গ্রহে পদার্পণ করার আগে আবারও সাবধান বাণী ভেসে এলো, "আমাদের এই বায়ুমন্ডল তোমাদের পৃথিবীর মতো দূষিত নয়। এখানে কোন দূষণ নেই। তাই কোনভাবে এখানে দূষণ সৃষ্টি করবে না।" তোমাদের পৃথিবী তার দূষণের জন্য আর কিছুদিনের মধ্যে লুপ্ত হয়ে যাবে।

মানুষ তাই ভিন্ন গ্রহের বাসিন্দা হতে চাইছে। এখন থেকে চেষ্টা করছে মঙ্গল, বৃহস্পতি ইত্যাদি গ্রহে বসবাস করা যায় কি না। বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিস্কার ক্রমশঃ মানুষকে যন্ত্রে পরিণত করছে। এভাবেই একদিন মানুষের আর মনুষ্যজীবন থাকবেনা। ধীরে ধীরে আত্মায় পরিণত হবে। সৃষ্টি হবে কিছু তরঙ্গ-এর। মানুষ তার দ্বারা চালিত হবে। এই মহাজাগতিক, মহাশূন্যে বিচরণ করছে অসংখ্য ইলেকট্রন, প্রোটন ও আরো অনেক সূক্ষ সব কণা যাদের দুরন্ত গতি মহাজাগতিক চৌম্বক-এর ক্রিয়ায় সৃষ্টি করছে শক্তিশালী তরঙ্গ। প্রাণের সৃষ্টির রহস্য কি এর মাঝেই লুকিয়ে আছে? আজও এই গভীর রহস্যের সমাধান আমরা খুঁজে পাই নি।

এই ভাবনার মধ্যে আবার এক তরঙ্গ ভেসে এলো, "কি ভাবছো পৃথিবীর মানুষ ? প্রাণের সৃষ্টির রহস্য কি ? মহাজাগতিক এই মহাশূন্যের মাঝেই আছে এর উত্তর। আর কিছুদিনের মধ্যেই মানুষ তা প্রমাণ করতে পারবে। কিন্তু তার এই বৈজ্ঞানিক আবিস্কার নিয়ে আসবে চরম অভিশাপ। তোমরা ধ্বংস করবে তোমাদের এই সুন্দর পৃথিবীকে। তার কারণ কি জানো ? তোমাদের এই আবিস্কার যে সব রোবট কাজ করার জন্য সৃষ্টি হবে, তারা তাদের সৃষ্টিকর্তাকেই শেষ করে ফেলবে। যন্ত্র স্থান নেবে মূল চালকের ভূমিকায়। সব কিছু চালনা করবে সেই। তার প্রয়োজন মতো সে প্রাণের সৃষ্টি করবে। আত্মাকে তরঙ্গে পরিণত করবে, ছড়িয়ে দেবে এক সৌরজগত থেকে আরেক সৌরমন্ডলে। মৃত্যুর পর আত্মার অস্তিত্ব আছে কি না, বা তরঙ্গে পরিণত হয় কি না, বা তার পুনর্জন্ম হয় কি না, সে উত্তর ও ভবিষ্যতে জানিয়ে দেবে।" .....

হঠাৎই প্রচন্ড একটা ঝাঁকুনি আর মায়ের বকুনি শুনে ধড়মড়িয়ে উঠে বসলাম। মাকে জিজ্ঞেস করলাম "আমি ব্ল্যাক হোল থেকে বেরিয়ে এসেছি"? আর একটা থাপ্পড় ও কানমোলা খেয়ে বাস্তব জগতে ফিরলাম। সন্ধ্যার অন্ধকার অনেকক্ষণ হয়েছে। তাই শাস্তি প্রাপ্যই ছিল।

সুজয় দত্ত

# উপহার

আজকাল আর জিজ্ঞেস-টিজ্ঞেস করে না মেয়েটা। সোজা ঝাঁটা আর ঝুলঝাড়ু হাতে ঘরে ঢুকেই পাখাটা বন্ধ করে আলোটা জ্বেলে দেয়। তারপর খাটের তলা, টেবিল-চেয়ারের তলা, আলমারির তলা – সর্বত্র সপাসপ ঝাঁটা চালাতে থাকে দ্রুতহাতে, যেন ঘোড়ায় জিন দেওয়া আছে। দরজা-জানলার পাল্লার পেছনে, দেয়ালের কোণে, পাখার ব্লেডের গায়ে ঝুল ঝাড়ে লম্বা ডাঁটিঅলা পালকের ঝাড়ুটা দিয়ে। ডাঁটির অন্যপ্রান্তটা ইজিচেয়ারে খবরের কাগজ বা বই হাতে আধশোয়া সুধাময়কে খোঁচা দিচ্ছে কিনা বা ঝুলগুলো খসে খসে তাঁর জলের গ্লাসে পড়ছে কিনা – সেদিকে কোনো খেয়ালই নেই। মাঝে মাঝে উনি "অ্যাই মালতী! কী হচ্ছে কী?" বলে মৃদু ধমক দিলে তখন টনক নড়ে, ঝাঁটাঝাঁড়ু সামলে "কী আবার? কাজের সময় কাজ করবনি?" বলে গজগজ করতে করতে বেরিয়ে যায়। পাখাটাও চালিয়ে দিয়ে যায়না, মনে করিয়ে না দিলে। বৌদিমণির আস্কারা পেয়ে পেয়ে আজ এই অবস্থা মেয়েটার – ভাবেন সুধাময়। তাঁর অবসরজীবন শুরু হওয়ার আগে অবধি এ-বাড়ীতে যারা কাজ করেছে, তাদের সাহস হতো এমন আচরণের? চিরকাল এই পুরোনো আমলের তিন-কামরার ফ্ল্যাটবাড়ীতে সব ব্যাপারে তাঁর কথাই ছিল শেষ কথা। সেসব দিনগুলোকে এখন স্বপ্নের মতো মনে হয়। গত বারো বছরে সবকিছু কেমন বদলে গেল – ভেবে একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলেন তিনি।

বদলের শুরুটা অবশ্য অবসরের সঙ্গে সঙ্গে হয়নি। পঁয়ষট্টিতে পা দেওয়ার সাত দিন বাদে যখন বিরাট সংবর্ধনা আর প্রচুর উপহার-টুপহার পেয়ে শেষবার অফিস থেকে বাড়ী ফিরলেন, সুরঞ্জনা তখনও বেঁচে। দিব্যি স্বামী-ছেলে-বৌমা-নাতনী নিয়ে সংসার করছেন, সবদিকে তীক্ষ্ণ নজর। হেঁশেল সামলানো, ঠাকুর পুজো, সুধাময়ের যত্নআত্তি, ছেলে-বৌ কাজে বেরিয়ে গেলে নাতনীকে আগলে রাখা – কোনোকিছুতেই খামতি নেই। তার পরের তিন বছরে কী যে হয়ে গেল! সুরঞ্জনার যখন বেশ কিছুদিন ধরে খিদে হচ্ছিল না, সারাক্ষণ পেট ভারভার, এমনকী পালপার্বণে উপোস-টুপোসের পরেও কোনোকিছু মুখে দিতে রুচি নেই, সেটাকে হালকভাবেই নিয়েছিল বাড়ীর সবাই। বয়স হলে মানুষের খাওয়াদাওয়ায় আসক্তি এমনিতেই কমে যায়। ভুল ভাঙল যেদিন অসহ্য যন্ত্রণা শুরু হল পেটে। কোনো ওষুধেই কমে না। পাড়ার ডাক্তার নানাভাবে চেষ্টাচরিত্র করে ব্যর্থ হয়ে শেষমেষ স্পেশালিস্টের কাছে যখন পাঠালেন, অনেক দেরী হয়ে গেছে। মারণব্যাধি ছড়িয়ে গেছে অগ্ন্যাশয় থেকে যকৃৎ আর ফুসফুসে। এই অমোঘ মৃত্যুপরোয়ানার কথা জানার পরও হাল ছাড়েননি সুধাময়। প্রায় চল্লিশ বছরের জীবনসঙ্গিনীকে কর্কটরোগের নিষ্ঠুর থাবা থেকে ছিনিয়ে আনতে কম লড়াই করেননি। ঠাকুরপুকুর ক্যান্সার হাসপাতালের সেই দুঃসহ দিনগুলো আজও মাঝে মাঝে ফিরে আসে তাঁর দুঃস্বপ্নে।

তাঁর আদরের রঞ্জা যেদিন চলে গেলেন, সেটা ছিল সুধাময়ের জন্মদিন। আটষট্টি পূর্ণ হল। যতদিন শয্যাশায়ী হয়ে পড়েননি, ঘটা করে না হলেও স্বামীর জন্মদিনটা প্রতিবছর পালন করতেন সুরঞ্জনা। নিজের হাতে পায়েস করে, পাঁচরকম ভাজা দিয়ে থালা সাজিয়ে, খাওয়ার সময় প্রদীপ জ্বেলে, শাঁখ বাজিয়ে। জীবনের শেষ দুবছর বিছানায় শুয়ে শুয়েও বৌমাকে নির্দেশ দিয়ে করিয়েছেন ওসব। শাশুড়ী মারা যাওয়ার পরের বছর ঐদিন তাঁর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে একটা ছোটখাটো অনুষ্ঠান হয়েছিল বাড়ীতে, তারপর থেকে রূপছন্দাও আর শ্বশুরের জন্মদিন পালনের কথা তোলেনি, আর তুললেও উনি রাজী হতেন না। নীরবে ইজিচেয়ারে শুয়ে টাটকা রজনীগন্ধার মালা পরানো ছবির ফ্রেমটার দিকে সারাদিন তাকিয়ে স্মৃতিরোমন্থনেই বরং অনেক বেশী শান্তি। এই একটা মৃত্যু যে তাঁকে কতখানি একা করে দেবে, প্রথমদিকে বুঝতে পারেননি সুধাময়। বিশেষতঃ, তার বছর দেড়েকের মধ্যেই একটা ফুটফুটে নাতি হল যখন, তাকে নিয়েই কেটে যেত দিন। নাতনীও ছোটবেলায় দাদুর খুব ন্যাওটা ছিল।

কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পাল্টে গেল জীবনের রং। ছেলে তার কিছুদিনের মধ্যেই ডেপুটি ডিরেক্টর হওয়ায় কাজের চাপ বেড়ে গেল প্রচন্ড। রাতটুকুই শুধু থাকে বাড়ীতে, ছুটির দিনেও কখনো কখনো অফিসে দৌড়োতে হয়। আর রূপছন্দা চলনে বলনে মানসিকতায় আধুনিকা। গৃহবধূ হয়ে বাড়ী বসে থাকার মেয়ে কোনোদিনই নয়। নাতির জন্মের সময় শাশুড়ীর অনুপস্থিতির দরুণ চাকরি ছাড়তে বাধ্য হয়েছিল বৌমা, কিন্তু নাতি মন্টেসরির আপার ডিভিশনে উঠতেই চেষ্টাচরিত্র করে আবার একটা জুটিয়ে নিল। মাইনে যেমন ভাল, কাজের চাপও তার সঙ্গে মানানসই। আপত্তি করেননি সুধাময়। মানুষের ইচ্ছের বিরুদ্ধে কোনোকিছু জোর করে চাপিয়ে দিতে বরাবরই তাঁর অনীহা। তাছাড়া বাধা দিতে গেলে সেই চাপা অসন্তোষ যে পারিবারিক অশান্তির রূপ নিতে পারে, তা এই বয়সে তাঁর একেবারেই অভিপ্রেত নয়। ছেলে-বৌকে বলেছিলেন, তিনি তো বাড়ীতেই থাকছেন সারাদিন, তাই দুপুরে অনতিদূরের মন্টেসরি স্কুল থেকে নাতিকে নিয়ে আসা আর বিকেলে নাতনীর স্কুলের গাড়ী তাকে নামিয়ে দিয়ে গেলে জলখাবার-টাবার খেতে দেওয়া – এগুলো ঠিকঠাক সামলে দিতে পারবেন। আর সেইসময় নাতনী নীচু ক্লাসে পড়ত, তার হাজার রকম এক্সট্রাকারিকুলার অ্যাক্টিভিটি বা টিউটরের কাছে কোচিং নিতে যাওয়ার ঝামেলা ছিলনা। বিকেলে স্কুল থেকে ফিরে বাড়ীতেই থাকত, দাদুই দরকারমতো দেখিয়ে দিতেন পড়াশোনা। এখন সে ক্লাস টেনে, দুদিন বাদে আই সি এস ই দেবে, পড়াশোনা আর অ্যাক্টিভিটির চাপে নাওয়াখাওয়ার সময় নেই। স্কুল, বন্ধুবান্ধব, টিউশন – এসবের বাইরে তার যেটুকু সময়, তাও বেশিরভাগটাই যায় স্মার্টফোন নামক এক নতুন আপদের পিছনে। সারাক্ষণ হয় পুটুর পুটুর করে ফোন টিপছে, নয়তো কানে সাদা মটরদানার মতো ইয়ারফোন লাগিয়ে বসে আছে – ডাকলে সাড়া পাওয়া যায়না। ভাবলে অবাক লাগে, এই মেয়েই একদিন বায়না করেছে সে দাদু-দিদা ছাড়া আর কারো সঙ্গে শোবেনা, শুধু দাদুর সঙ্গেই লুডো আর চেকার্স খেলবে, শুধু দিদার কাছেই সাজগোজ করবে। সত্যি, সময় যে নিঃশব্দে কতকিছু ছিনিয়ে নেয় –।

বাড়ীতে নাতিই একমাত্র যার সঙ্গে এই কয়েক বছর আগে অবধিও দিনে অনেকটা সময় কাটত তাঁর। সত্যি বলতে কী, সুধাময় ছিলেন বলেই ছেলেটার ছোট থেকে কার্টুন চ্যানেল বা ভিডিওগেমের নেশা হয়নি। দাদুর কাছে গল্প শুনে, দাদুর সঙ্গে বই পড়ে, দাদুর হাত ধরে পার্কে খেলতে গিয়ে কেটেছে তার শিশুবেলা। কিন্তু যেই সে ক্লাস সিক্সে উঠল, পুরোনো প্রাইমারী স্কুলটা ছেড়ে আরও বড় স্কুলে ভর্তি হল, অমনি দ্রুত বদলে গেল সেসব। সেন্ট্রাল বোর্ডের সেই স্কুলে এই বয়স থেকেই যা পড়ার চাপ আর যেরকম তীব্র প্রতিযোগিতার ইঁদুর-দৌড়, টিঁকে থাকতে হলে তার শৈশবকে 'গুডবাই' বলা ছাড়া গতি নেই। আর শুভঙ্কর-রূপছন্দার, মানে ওর বাবা-মার, ছেলেকে নিয়ে উচ্চাকাঙ্ক্ষাটা দেখা যাচ্ছে মেয়ের ক্যারিয়ার নিয়ে যা ছিল তার চেয়ে অনেক বেশী। তাই এই বয়স থেকেই সে ম্যাথস অলিম্পিয়াডের জন্য বিশেষ কোচিংয়ে যায়। সায়েন্সের জন্য আলাদা টিউটর তো আছেই। তাহলে ওদের ভাষায় যাকে বলে 'গ্রাডপেরেন্টের' সঙ্গে 'কোয়ালিটি টাইম' কাটানো – তার কী হবে? সরি, ওটা তো আই সি এস ই-র সিলেবাসে নেই। কলেজের ক্যাম্পাস ইন্টারভিউতেও ও-নিয়ে প্রশ্ন করে কি? আসলে এই সমাজ, এই দুনিয়া – কোথাও ওই জিনিসটার জন্য কোনো 'ইনসেনটিভ' নেই।

অতএব সুধাময় এখন একা। বাইরে থেকে দেখে বুঝবেনা লোকে। মহানগরের এই জমাটি এলাকায় তিন-কামরার ফ্ল্যাটে পাঁচজনের ব্যস্ত সংসার। সেখানে আবার একা হওয়া যায় নাকি? যায়, ভীষণভাবে যায়। কদিন আগেই এক সোমবার রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগে তিনি মনে মনে হিসেব করছিলেন গত আঠেরো ঘন্টায় বাড়ীর অন্য বাসিন্দাদের সঙ্গে তাঁর কটা কথা হয়েছে। অবাক হয়ে দেখলেন, আঠেরোবারও বাক্যবিনিময় হয়নি। এই তো, সকালবেলা উঠতে না উঠতেই মালতীর "বৌদিমণি বিছানাটা ঝাড়তি বলতিচে, এট্টু ইজিচিয়ারে গিয়ে বসতি হবে", তারপর বৌমার "আজ চায়ে চিনি দিয়ে ফেলেছিলাম, তাই সকালে আর আপনাকে দিইনি। এই নিন, নতুন করে করেছি।", তারপর সদ্য ঘুম থেকে ওঠা গলায় তোয়ালে মুখে টুথব্রাশ ছেলের "কাল কী বলছিলে রাত্তিরবেলা, কোন ওষুধটা ফুরিয়েছে? দেখি, তার অ্যালুমিনিয়াম ফয়েলটা দাও তো, এখনই ঢুকিয়ে নিই ব্যাগে, পরে ভুলে যাব –"। তারপর অনেকক্ষণের বিরতি – সেই সত্তরের দশকে কলকাতায় নতুন আসা সাদাকালো টিভিতে মাঝে মাঝে টেলিকাস্ট আটকে গেলে যেমন সাময়িক

নীরবতা নেমে আসত, খানিকটা সেইরকম, যদিও এক্ষেত্রে "রুকাবট কে লিয়ে খেদ হ্যায়" বলার কেউ নেই। ইতিমধ্যে অবশ্য বাড়ীতে রোজকার নাটক যা যা চলার সবই চলছে – বাথরুমের দখল নিয়ে ভাইবোনের কাড়াকাড়ি, মালতীকে বৌমার দফায় দফায় বকুনি, অফিসের কার সঙ্গে যেন ছেলের লম্বা ফোনালাপ, খবরের কাগজঅলার বেল টিপে কাগজ দিয়ে যাওয়া, ইত্যাদি। কিন্তু সবই তাঁর ঘরের পর্দাঢাকা দরজার বাইরে। অবশেষে পর্দা ফাঁক করে "চলি, আজ ফিরতে রাত হবে একটু, নিউটাউন মার্কেট ঘুরে আসব, তোমার চ্যবনপ্রাশ টাও নিয়ে আসব" আর "বাবা, আপনার খাবারটা আজ মাইক্রোওয়েভ ওভেনের ভেতরেই রেখে গেলাম, টেবিলে রাখলে পিঁপড়ে হয় বলেন" বলে ছেলে-বৌমা কাজে বেরিয়ে যাবার পর মালতীর "গেলাম গো দাদু, দোরে চাবি দাও" দিয়ে শেষ হল তাঁর সকালের কোটা। তারপর টানা ছ'ঘন্টা বাড়ীতে আর জনপ্রাণী নেই। পড়ন্ত দুপুরে মুহুর্মুহু কলিং বেলে তাঁর তন্দ্রা ভাঙিয়ে বাড়ী ঢুকেই নাতি বিছানায় ব্যাগটা ছুঁড়ে ফেলে টিভির সামনে বসে পড়ল ক্রিকেট দেখতে। "কিরে, খাবারটা গরম করে দিই? খেতে খেতে দ্যাখ?" এর উত্তরে শুধু বিরক্ত গলায় শুনলেন "না না পরে পরে – জাস্ট সেভেন মোর ওভারস রিমেইনিং"। আধঘন্টা বাদে নাতনীর ফেরার পালা। বেল শুনে দরজা খুলে দেখেন যথারীতি সে ডানহাতে ব্যাকপ্যাক ঝুলিয়ে বাঁহাতে ফোন কানে করে দাঁড়িয়ে আছে। "কিরে, আজ একটু মুখহাত ধুয়ে টিফিনটা খাওয়ার সময় আছে তো, নাকি আবার এক্ষুণি কোনো বন্ধু-টন্ধু এসে হাজির হবে?" বলাতে তার অন্যমনস্ক জবাব, "দ্যাট আই উইল টেল ইউ টুমরো"।

"মানে? এখন খাবি কিনা সেটা কালকে বলবি?"

"দুত্তেরি, ওটা তোমাকে বলিনি। দেখছো না ফোনে কথা বলছি? ডোন্ট ওরি, আই উইল ওয়ার্ম ইট আপ মাইসেলফ"। বলে সে বাথরুমে ঢোকে। আর সুধাময় গিয়ে বসেন বারান্দার বেতের চেয়ারটায়, হাতে মোটা শরদিন্দু অমনিবাস। কারণ উনি জানেন এর পরের বাক্যালাপ হতে হতে আরো ঘন্টা দুই। সেদিন অবশ্য দুঘন্টার বদলে তিনঘন্টা হল, কারণ বৌমা বাইপাসের বিরাট জ্যামে আটকে গিয়ে ফিরল বেশ দেরী করে। এসেই ছেলেকে টিউটরের কাছে নিয়ে যাওয়ার আগে শুধু একটা প্লেটে দুটো গরম সিঙাড়া হাতে বারান্দায় শ্বশুরকে গিয়ে বলার সময় পেল, "এই নিন। গরম আছে এখনও। চা এখন বসাব, না জিৎকে কোচিংয়ে দিয়ে এসে?" বেচারী হাঁপাতে হাঁপাতে এসে আবার এক্ষুণি বেরোচ্ছে দেখে উনি জানালেন চায়ের কোনো দরকার নেই। অতঃপর বাজার-টাজার হাতে ছেলে বাড়ী ঢোকা অবধি আবার নৈঃশব্দ্য, কারণ নাতনী দরজা বন্ধ করে পড়তে বসেছে আর বাকীরা বাড়ীর বাইরে। সাড়ে নটা নাগাদ ছেলে ফেরার সময় অবশ্য টের পাননি তিনি, ইজিচেয়ারে শুয়ে বই পড়তে পড়তে কখন যেন চোখে ঘুম লেগে গেছিল। তাই তাঁকে আর রাতের খাওয়ার আগে ডাকেনি কেউ। রাতে ডাইনিং টেবিলে খাওয়ার সময় প্রতিদিনই সেখানকার টিভিতে নাতি বা নাতনীর পছন্দের চ্যানেলে কোনো "মাস্ট সী" প্রোগ্রাম চলে, নাহলে বৌমার পছন্দের কোনো সিরিয়াল। তাই কথাবার্তা বিশেষ হয়না, হলেও সেটা জিৎ আর জিনিয়ার হাহা-হিহি, ওয়াও বা ও মাই গড। খাওয়াদাওয়ার পর্ব চুকে গেলে বিছানায় আশ্রয় নেওয়ার আগে একবার শুধু শুনলেন ছেলে এসে টেবিলে ওষুধ আর চ্যবনপ্রাশ রাখতে রাখতে বলছে "এবার বড় বোতল এনেছি, অনেকদিন চলবে তোমার"। ব্যস, দিন শেষ।

এভাবেই তাহলে কাটবে জীবনের বাকী বছরগুলো? এরকম অনিবার্য, প্রতিকারহীন মৌনব্রতে? নাহয় কাটলই – কী আসে যায় তাতে? সামনের মাসে আশিতে পা দিচ্ছেন। আর তো বেশী বাকিও নেই। এসব চিন্তা মাথায় এলে রাতে ঘুম আসতে চায়না সুধাময়ের। বিছানায় এপাশ ওপাশ করতে থাকেন। মাঝে মাঝে মনে হয় তাঁর এ দশা দেখে সুরঞ্জনা ওপর থেকে মিটিমিটি হাসছেন। স্ত্রীকে সারাজীবন বলে এসেছেন "বড্ডো বেশী কথা বল তুমি। বলবে কম, ভাববে বেশী"। আর আজ এমনই পরিহাস – নিজেই নৈঃশব্দ্যের কারাগারে বন্দী। তাঁর বয়সী অন্য অনেকের কাছে এই সমস্যার একটা সহজ সমাধানসূত্র আছে। তার নাম টিভি। চব্বিশ ঘন্টা সেখানে সিরিয়াল, গানবাজনা, ট্যালেন্ট শো, রিয়ালিটি শো – বিনোদনের ফোয়ারা। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, সুধাময় কর্মজীবনেও খবর আর খেলা ছাড়া টিভির কাছে ঘেঁষতেন না বড় একটা, অবসরজীবনেও সেই অভ্যেসটা তৈরী করতে পারেননি কিছুতেই। তাঁর সারাক্ষণের সঙ্গী হল

বই। তাঁর বাবার আমলের কাঠের আলমারিটায় পুরোনো ক্লাসিক্স আর রচনাসমগ্র কম নেই। ভাগ্যিস চোখটা এখনো ভাল আছে। তবে মূল সমস্যাটা রয়েই যাচ্ছে। বই তো আর কথা বলে না।

আজও বালিশে মাথা দিয়ে খানিক উশখুশ করার পর এক গ্লাস জল খাবেন বলে খাটের পাশের টেবিলটার দিকে হাত বাড়িয়ে দেখেন জলের জগটা নেই। তার মানে ওটা ডাইনিং টেবিলেই পড়ে আছে, আনতে ভুলে গেছেন। আস্তে আস্তে উঠে দরজার পর্দা ফাঁক করে দেখলেন ডাইনিং রুমে তখনও আলো জ্বলছে, দুই ভাই-বোন দুটো চেয়ার দখল করে বসে কীসব গুজগুজ ফুসফুস করছে। ওঁর দিকে পেছন ফেরা, তাই দেখতে পায়নি। একটু অবাক হলেন সুধাময়। মাঝরাত হতে চলল, এখন কী এত জরুরী শলাপরামর্শ? অন্যদিন তো খাওয়া শেষ হতে না হতেই একজন বিছানায় স্মার্টফোন কানে আর অন্যজন বাবা-মার শোবার ঘরের টিভিটায় স্পোর্টস চ্যানেলে মগ্ন। কৌতূহলে কান পাতেন তিনি। এরা যখন নিজেদের মধ্যে কথা বলে, তাতে মাতৃভাষার 'ম'-ও থাকেনা। কী আর করা যাবে – ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে তো আজকাল বাংলার দ্বিতীয় ভাষার মর্যাদাটাও জোটে না অনেকসময়। আজ কয়েকটা শব্দ কানে আসছে বারবার – ইনভিটেশন, সারপ্রাইজ, এইট্রিয়েথ, দাদু, গিফট। ক্রমশঃ ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে আসে তাঁর মাথায়। আচ্ছা, এই ব্যাপার! তাঁর আসন্ন আশিতম জন্মদিনে সারপ্রাইজ পার্টির ষড়যন্ত্র হচ্ছে! নিঃশব্দে এসে আবার শুয়ে পড়েন তিনি। মনের মধ্যে ঘুরপাক খেতে থাকে দুটো কথা – "গিফট" আর "লেটস আস্ক হিম হোয়াট হি ওয়ান্টস"। ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি ফুটে ওঠে। একসময় চোখে নেমে আসে ঘুম।

পরদিন স্কুল থেকে ফিরে টিভির সামনে বসার আগে নাতি বলল, "দাদু, আই হ্যাভ এ কোয়েশ্চেন ফর ইউ"।

"কী? ইংলিশ গ্রামার-টামারের কোনোকিছু?"

"না না, সামথিং টোটালি ডিফারেন্ট।"

"আচ্ছা, শুনব'খন। আগে খেয়ে নে। খাবারটা গরম করে দিই?" সুধাময় মনে মনে ভালই আন্দাজ করতে পারছেন কী বলবে ও, কিন্তু মুখে নির্বিকার রইলেন। ওর খাওয়া শেষ হবার আগেই বাড়ী ঢুকল দিদি। কাঁধ থেকে ব্যাগ আর কান থেকে ফোন নামিয়ে বাথরুমে ঢোকার আগে ভাইকে চকিত প্রশ্ন, "হ্যাভ ইউ আস্কড হিম অলরেডি?"। ভাইয়ের নেতিবাচক মাথা নাড়া দেখে "ওকে, আয়াম কামিং" বলে দড়াম করে বাথরুমের দরজাটা বন্ধ করে দিল। সেখান থেকে বেরিয়েই ডাইনিং টেবিলে রাখা খাবারের প্লেটের দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে সোজা পিছনের বারান্দায়, যেখানে সুধাময় বেতের চেয়ারে বসে আছেন মুখের সামনে খবরের কাগজ মেলে ধরে। ভাইও ছুটে এসেছে খাওয়া অর্ধসমাপ্ত রেখে। সে-ই প্রথম শুরু করল, "দাদু, আর ইউ লিসেনিং?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, শুনছি। কী ব্যাপার?" বলে মুখ থেকে কাগজ নামিয়ে নাতনীকে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করেন, "কী রে, খেলি না? ঢাকা দিয়ে রেখে এলাম তো টেবিলে।"

"খাচ্ছি, খাচ্ছি। আগে একটা ইম্পর্টেন্ট ব্যাপারে তোমার সঙ্গে কথা আছে। কিছুতেই ডিসাইড করতে পারছি না।" নাতনী অন্ততঃ দাদুর সঙ্গে কথোপকথনের সময় মাতৃভাষাটা বলার চেষ্টা করে।

"বটে? কী এমন ব্যাপার?"

"নেক্সট মান্থের ফার্স্ট উইকে একটা জিনিস আছে। ইটস অ্যাবাউট ইউ, সো আমরা ভাবলাম তোমাকে জিজ্ঞেস করাই বেস্ট।"

"সামনের মাসের গোড়ায়? আমার আবার কী আছে? ডাক্তার চেক-আপের কথা বলছিস?" সুধাময় খেলাতে থাকেন ওদের, বুঝতে দেন না গোড়াতেই বুঝে ফেলেছেন।

"ধ্যাৎ, ডক্টরস অ্যাপয়েন্টমেন্টের কথা কে বলেছে? বলছি তোমার বার্থডের কথা। দিস টাইম উই আর থিংকিং দ্যাট –" বলে একটু দম নেয় জিনিয়া।

"ওহ, তাই বল। আমার আবার জন্মদিন। জানিস না – মানুষ বুড়ো হলে তার আর জন্মদিন থাকে না?"

"স্টপ সেয়িং দ্যাট, দাদু। ইউ আর টার্নিং এইট্টি – উই হ্যাভ স্পেশ্যাল প্ল্যানস ফর ইউ। ডোন্ট ইউ ওয়ান্ট টু হিয়ার?" নাতি অধৈর্য্য হয়ে ওঠে।

"স্পেশ্যাল প্ল্যানস? বাব্বা। তা, তোমাদের প্ল্যান তোমাদের কাছেই থাক। আমায় আগে থেকে বলে দিলে সারপ্রাইজ থাকবে না তো।"

"রাইট, সব আমরাই করব, ইউ ডোন্ট নিড টু ওয়ারি। শুধু একটা সাজেশান চাইছি – কী রকম গিফট পেলে তোমার ভাল লাগবে সেটা একটু বল। আই মীন, সামথিং দ্যাট উইল বি রিয়েলি ইউসফুল টু ইউ –", নাতনী এবার আসল কথায় আসে।

সুধাময় চুপ করে থাকেন একটুক্ষণ। তারপর মুচকি হেসে বলেন, "ঠিক আছে, শুনে নিলাম, এবার একটু ভাবি। আমার তো কোনো জিনিসেরই সেরকম অভাব নেই, তাই একটু চিন্তা করে দেখতে হবে।"

"হাউ লং? উই নিড সাম প্রিপারেশন টাইম। ইটস কামিং আপ সুন্।" নাতির গলায় অস্থিরতা।

"আচ্ছা, আমি যে এই শুক্রবার তোদের পিসীদিদুর বাড়ী যাচ্ছি কদিনের জন্য, শুনেছিস মা-বাবার কাছে? ওখানে যাবার ঠিক আগে বলে দিয়ে যাব। চিন্তা করিস না।" আশ্বাস দেন তিনি।

"ডিড নট নো দ্যাট। কতদিন থাকবে?"

"এই, দিন সাত-আট।"

"দ্যাট মিন্স ইউ আর রিটার্নিং অলমোস্ট রাইট বিফোর ইয়োর বার্থডে। হোয়াই কান্ট ইউ কাম ব্যাক আর্লি?" কৈফিয়ত চাওয়ার ভঙ্গীতে বলে জিৎ।

"বাহ, ওখানেও যে আমার দুই নাতি-নাতনী আছে। টুপাই-দাদা আর টুসি দিদির কথা ভুলে যাসনি নিশ্চয়ই। ওদের সঙ্গে সময় কাটাতে ইচ্ছে করে না মাঝে মাঝে?"

"ওকে। বাট ডোন্ট ফরগেট টু আনসার আওয়ার কোয়েশ্চেন বিফোর ইউ লীভ।" বলে চলে যায় দুজনে ডাইনিং রুমের দিকে। আবার নীরবতা নেমে আসে সুধাময়কে ঘিরে সেই একচিলতে বারান্দায়।

সেই শুক্রবার দুপুরে যখন ওলা ট্যাক্সিতে করে তাঁর ভাইরাভাই নিতে এল তাঁকে, জিৎ আর জিনিয়া তখনও স্কুলে। ওদের বাবা-মা অফিসে। সব গুছিয়ে নিয়ে সদর দরজার চাবি পাশের ফ্ল্যাটে রাখতে গিয়ে হঠাৎ মনে পড়ে তাঁর – একটা দরকারী কাজ তো করতে ভুলে গেছেন। আবার ফিরে এসে আগের রাতে লেখা একটা চিঠি ভাঁজ করে নাতনীর ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ারে রাখেন। তারপর নিশ্চিন্তে গাড়ীতে ওঠেন।

"দিদিভাই, দাদুভাই,

চিঠিটা খুঁজে পেতে অসুবিধে হয়নি তো? আরেকটু হলেই ভুলে যাচ্ছিলাম রেখে যেতে। ভাগ্যিস মনে পড়ল।" দুই ভাইবোন ওদের ঘরের বিছানায় কনুই রেখে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে চিঠিটার ওপর। কৌতূহলে চোখ বড়বড়। বাংলা পড়তে দুজনেই পারে, তবে জিনিয়া বেশী স্বচ্ছন্দ।

"সেদিন তোমরা যখন জিজ্ঞেস করলে আমার জন্মদিনে কী চাই, নিজের ছোটবেলার কথা মনে পড়ে গেল। তোমাদের বড়দাদু, মানে আমার বাবা তো খুব অবস্থাপন্ন ছিলেন না – দাঁড়াও, একটা শক্ত শব্দ লিখে ফেললাম বোধহয় – মানে উনি তো গরীব ছিলেন, তাই আমার বা তোমাদের জ্যেঠুদাদুর বা পিসীদিদুর সেভাবে কখনো জন্মদিন করা হতোনা। শুধু হয়তো তোমাদের বড়ঠাম্মা দুএকটা নতুন রকম রান্না করতেন যা আমরা খেতে ভালবাসি। কিন্তু জানো, তাও আমার প্রতিটা জন্মদিনে সবচেয়ে পছন্দের উপহারটাই পেয়েছি। কী করে? কারণ ঠিক তোমাদের মতোই আমারও তো একজন দাদু ছিলেন। তিনি উঠতে পারতেন না বিছানা থেকে, রাতদিন শুধু শুয়েই থাকতেন। তাঁর বাড়ী ছিল আমাদের কলকাতার ছোট্ট ভাড়াবাড়ীটা থেকে বেশ দূরে একটা গ্রামে। গরুর গাড়ীতে করে যেতে হত। ভাবছ গরুর গাড়ী আবার কী জিনিস? তোমরা তো দেখই নি, বোঝাব কী করে? তোমাদের গুগল আর উইকিপিডিয়া না কী যেন আছে, সেখানে হয়তো পুরোনো ইতিহাস খুঁজলে পাবে। যাইহোক, একটা সময় আমার প্রত্যেক জন্মদিনে তোমাদের বড়দাদু আর বড়ঠাম্মার সঙ্গে যেতাম সেখানে। আর তখনই জুটত সেই সেরা উপহার। কী জানো সেটা?"

চিঠির প্রথম পাতা এখানেই শেষ। পরের পাতায় যাবার আগে দুই ভাইবোন চোখ চাওয়াচাওয়ি করে একবার। দুজনের চোখেই কৌতূহল ঠিকরে বেরোচ্ছে।

"গ্রামের মাঝখানে একটা পুকুরের ধারে সেই মাটির বাড়ীটায় ঢুকেই তোমার জ্যেঠুদাদু পাড়ার ছেলেদের দলের সঙ্গে ভীড়ে মাঠে খেলতে চলে যেত, তোমাদের বড়ঠাম্মা গিয়ে ঢুকতো রান্নাঘরে তাঁর শাশুড়ীর কাছে আর বড়দাদু দালানে বসে সকলের সঙ্গে কথাবার্তা বলত। তখন আমি আর তোমার পিসীদিদু সোজা চলে যেতাম আমার দাদুর ঘরটায়। সেখানে ওঁর খাটের পাশে মাটিতে বসে বলতাম, "ও দাদু, গল্প বল।" আর দাদু পাশ ফিরে শুয়ে সেই যে গল্প বলা শুরু করতেন, থামতেই চাইতেন না। ঘন্টার পর ঘন্টা কেটে যেত। শুনতে শুনতে আমরা এটা-ওটা প্রশ্ন করতাম, উনি উত্তর দিতেন। বাড়ীর লোকে এসে তাড়া দিত – বেলা যে পড়ে এল খোকাখুকু, নাইবে খাবে কখন? আমাদের নাওয়াখাওয়া তখন মাথায় উঠেছে, গল্পের নেশায় বুঁদ। সারাদিন গল্পটল্প শুনে যখন সন্ধ্যেবেলা ফেরার সময় হয়ে যেত, তোমাদের বড়ঠাম্মা তাঁর শ্বশুরকে প্রণাম করে বলতেন 'বাবাঠাকুর ওদের আবদার রাখতে গিয়ে সারাদিন একটুও জিরোতে পারলেন না', আর সেই শুনে বুড়ো নীরবে ফোকলাদাঁতে হাসতেন। একরাশ মনখারাপ সেই হাসিতে, কারণ আমরা যে চলে যাচ্ছি।

আচ্ছা দিদিভাই, দাদুভাই, অনেককিছু লিখে ফেললাম, তবু শেষ করার আগে একটা কথা জিজ্ঞেস করি। তোমরা যে সবসময় কত ব্যস্ত সে তো দেখতেই পাই, তোমাদেরও নাওয়াখাওয়ার সময় নেই। তবু এরই মধ্যে কখনো কি ইচ্ছে করে এই বুড়ো দাদুটার পাশে বসে একটা দিন শুধু গল্প শুনে কাটিয়ে দিতে? অনেক দারুণ দারুণ গল্প আছে আমার ঝুলিতে, একদিন শুধু সময় করে শুনে দেখো। নাকি সেই ইচ্ছেটাই আসেনা মনে? প্রতিটা দিন সারা দুপুর সারা বিকেল আমি কী করে কাটাই জানতে ইচ্ছে করে না? বলি শোনো – খানিক খবরের কাগজ পড়ি, খানিক আশপাশের গাছগুলোতে বসা কাক-চড়াই গুনি, আর খানিক তোমাদের ঠাম্মার সঙ্গে কথা বলি, তবে তিনি তো আর উত্তর দেন না – ছবি হয়ে ঝুলে রয়েছেন যে দেওয়ালে। তারপর তোমাদের পথ চেয়ে থাকি কখন ইস্কুল থেকে ফিরবে। কিন্তু তোমরা ফিরেই টিভি, ফোন বা বন্ধুবান্ধব নিয়ে মশগুল হয়ে পড়, আর আমি একা একাই বসে থাকি।

আমার আশি নম্বর জন্মদিন পালন করার কথা যে তোমরা দুজন ভেবেছ, এতেই আমি ভীষণ, ভীষণ খুশী। কিন্তু সত্যি বলছি, তোমাদের ঐসব পার্টি, নেমন্তন্ন, কেক কাটা, হৈচৈ – ওরকম উৎসবের বয়স এখন আর আমার নেই। তার বদলে যদি পারো আমার পছন্দের উপহারটাই কেবল দিও। কী সেটা, যদি এখনো বুঝতে না পেরে থাক, বলেই দিই খোলাখুলি। ওই দিন তোমরা সবাই আমার সঙ্গে, শুধু আমার সঙ্গে একটু সময় কাটাবে ?

তোমরা জানতে চেয়েছিলে, তাই আমার ইচ্ছের কথা জানালাম। পূরণ করতে গিয়ে আবার নিজেদের ক্ষতি বা অসুবিধে কোরো না যেন।

অনেক আশীর্বাদ আর ভালবাসা রইল। ইতি।"

চিঠিটা হাতে নিয়ে নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা দিদির দুচোখের কোণে জল দেখে ভাইয়ের হাত থেকে আপনিই খসে গেল টিভির রিমোট।

সেই শনিবারের পরের শনিবার জিৎ-জিনিয়াদের ফ্ল্যাটে তাদের দাদুর আশিতম জন্মদিন পালন হয়েছিল সানন্দে। না. কেউ আমন্ত্রিত ছিলনা, কেক-মোমবাতিও ছিলনা। শুধু অনেক বছর বাদে এক নাতি আর এক নাতনী তাদের দাদুর ইজিচেয়ারের দুদিকে বসে জমিয়ে গল্প শুনল সারাদিন। কতরকমের সব গল্প। অবশ্য তারা ছাড়াও অন্য দুজন ছিল সেই 'উৎসবে'। তাদের মা আর বাবা – অফিস ছুটি নিয়ে। পুরোনো ছবির অ্যালবাম আর পুরোনো পারিবারিক অনুষ্ঠানের ভিসিডিতে ডুবে স্মৃতিচারণ করতে করতে বারবার শিশুর মতো উচ্ছল হয়ে উঠছিল তিন প্রজন্মের সেই পাঁচজন মানুষ। আর সকলের অলক্ষ্যে দেয়ালে টাঙানো একটা ছবিও একটু যেন দুলে উঠেছিল। সেই ছবির চোখেও যে সেদিন আনন্দাশ্রু।

জয়তী রায়

# খোঁজ

টুং। বেজে উঠলো মেসেজের ঘণ্টি। না তাকিয়েও পূর্বা বোঝে কার মেসেজ ! আড় চোখে নিলয়ের ঘরের দিকে তাকিয়ে দ্রুত হাতে খাবার টেবিলে পড়ে থাকা এঁটো বাসন সব পরিষ্কার করে ফেলতে লাগলো। রাত দশটা বাজে। নিলয় খেয়ে শুতে গেছে। এই সময় পূর্বার মোবাইল টুং টুং করলেই নিলয় আর মেয়ে মুনমুনের ভুরু কুঁচকে যাবে। অবাক লাগে পূর্বার ! মেয়ে বারো ক্লাস বোর্ড পরীক্ষা দেবে, তবু তার ফোন বন্ধ নেই। হাহা হিহি চলছে সমানে। তবে ? তার বেলা এমন কেন ? আর নিলয় ? এটা ঠিক, কদিন ধরে কাজের খুব চাপ চলছে। আজ নিলয়ের প্রিয় তেল কই করেছিল, কোনো রকমে হাই তুলতে তুলতে খেয়ে ঘুমোতে চলে গেলো। কাল আবার ভোরে বাঁকুড়া যাবে। তা সে তো এখন ঘুমপরীদের নিয়ে খেলছে। এতো নিত্যকার অভ্যেস নিলয়ের। খাবে দাবে নাক ডাকবে। এমন তো হতেই পারতো, চৈত্রের পূর্ণিমার একটা রাত ছাদে বসে কফি নিয়ে কাটানো যেত ? শীতের কোনো ছুটির দুপুরে বাজার থেকে বড়ো মাছের বদলে দুটো সিনেমার টিকিট এনে অবাক করে দিতে পারতো ? কিংবা কোনো মুল্লুকে বেরিয়ে পড়া যেত ! নাঃ। এই সব বাউন্ডুলেপনা চলবে না। খুব নিখুঁত মানুষ নিলয়। গোছানো পাশ বই, নিয়ম করে ডাক্তার, মেয়ের পড়া, গান, ফ্ল্যাট গাড়ী – বন্ধুরা বলবেই – পূর্বা ! তুই কি ভাগ্যবতী। আমাদের বর গুলো কিস্যু করবে না !

আচ্ছা ! এত নিখুঁত না হলেই বা ? এতো নিয়ম মেনে চলতে হবে ? নিয়ম মাঝে মাঝে ভেঙে ফেলার মধ্যে অদ্ভুত খুশী লুকিয়ে থাকে। মাকে লুকিয়ে ফুচকা খাওয়া বা এখন নিলয়কে লুকিয়ে গ্রামে বেড়াতে চলে যাওয়া ! আহা ! কি ভালো লাগে লুকিয়ে বাউন্ডুলে হবার এক আধ  দিনগুলো।

*****

টুং ! আবার মেসেজ। পরীক্ষা বলে মেয়ে ডিনার খেয়েই নিজের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করেছে। না হলে এমন ট্যারা চোখে মার ফোনের দিকে তাকাবে, যেন মা অধিকারের বাইরে কোনো কাজ করছে। শঙ্কিত চোখে ফোনটা একবার দেখে, টেবিল পরিষ্কার করে, রান্না ঘরে একটু স্প্রে ছড়িয়ে দিলো। সকালে ঠিকে লোক আসবে। কিন্তু খাওয়া বাসনে জল দিয়ে রাখা, বাপ মেয়ের ঘরে জলের বোতল পৌঁছে দেওয়া, ভোর বেলার জন্য একটু কিছু গুছিয়ে রাখা এগুলো তো নিত্য কর্ম। হাউস ওয়াইফ মানেই দুপুরে বিছানায় গড়ানো অথবা টিভি দেখা এগুলো সত্যি হয় কি ? শ্বাস ফেলে, তেল মশলার গন্ধওয়ালা ছোট তোয়ালে গুলো সাবান জলে ভিজিয়ে, কিছু শুকনো কাপড় রেখে দিয়ে কিচেনের লাইট অফ করে দিলো পূর্বা। কোন ডিউটি কম করছে সে ? বাড়ী, রান্না, শাশুড়ী, তার নিজের মা – সব দিক তো নজরে রেখেছে। শাশুড়ী তো সবসময় বলেন – "বৌমা আমার মানুষ খুব ভালো।"

এমনি আজ এত গরম পড়েছে যে বলার নয়। যদিও চৈত্র শেষের হাওয়া ছেড়েছে বেশ। ড্রইং রুমের দরজা জানলার পর্দা উড়ছে। একটু পরেই ঠান্ডা হয়ে যাবে মনে হয়। লাইট নিভিয়ে একটু বসা যায়। তার নিজের মায়ের শরীর ভালো নেই। কদিন ধরেই জ্বর। ওতো প্রাণোচ্ছল মানুষটা কেমন শুকিয়ে গেছেন। বাবা মারা যাবার পরে পূর্বাই মাকে বুকে আঁকড়ে রেখেছিল, কিন্তু মাঝে মাঝে এতো ব্যস্ত হয়ে পড়ে, গিয়ে খবর নিয়ে উঠতে পারে না। ভাই আছে। বৌদি আছে। সকলেই যে যার জগতে মগ্ন। মা একটু ছেলেমানুষ হয়ে গেছেন এটাও সত্যি। পূর্বা যেটা করবে সেটা তো আর পরের বাড়ির মেয়ের কাছ থেকে আশা করা যায় না। নিজের অজান্তেই চোখ চলে গেলো ছোট একটেরে ঘরটার দিকে। বৃদ্ধা শাশুড়ী আছেন শুয়ে। উনিশবছর বিয়ে হয়েছে পূর্বার, শাশুড়ী মা ছিল তার বন্ধু। দুজনে মিলে সিনেমা, শপিং এই

সব করে বেড়াতো। নিলয়ের কোনোদিন সময় নেই। ছোটবেলায় বাবা হারানো নিলয়ের কাছে মায়ের ভালোবাসা অনেকখানি একথা জানতো পূর্বা, কোনোদিন অমর্যাদা করেনি স্বামীর বিশ্বাসের। গত দুবছর শাশুড়ী শয্যাশায়ী। এতটুকু বিরক্তি না দেখিয়ে নিজের হাতে সেবা করে সুন্দর ঝকঝকে করে রাখে শাশুড়িকে। নিলয় ও তেমনি, যেই বুঝেছে পূর্বা সব পারে, নিজেকে, মাকে, সন্তানকে সংসারকে পূর্বার ওপরে ছেড়ে দিয়ে একবারে পত্নী গরবে গরবী স্বামীর মতো মাথা উঁচু করে নিশ্চিন্তে কাজ করে। পূর্বা ছাড়া ভগবানের নামটি পর্যন্ত মুখে আনে না নিলয়।

তবে এত অশান্তি কেন বুকের মাঝে ? কেন মানাতে পারে না সোনার শিকলের জীবনে ? শিকল ভাবাই বা কেন ? রোজকার জীবন কে থোড় বড়ি খাড়া ভাবা কেন ? কেন চোখের মাঝে চুঁইয়ে পড়ে একরাশ ক্লান্তি !

*****

টুং! বুকের মাঝে ধাক্কা দিলো ঐ সংকেত। এসেছে। সব হিসাবের গন্ডি ভেঙে ফেলতে রোজ আসে ঐ মেসেজ। কোনো মানে হয় ? কেনো এমন হলো ? সে ব্লক কেন করতে পারেনা ? তার রঙিন পর্দা ঝোলানো ঘর কাঁচের বাক্সে সুন্দর সোনালী মাছ, পরিপাটি সব কিছুর মাঝে এ কি বিষম কান্ড !

দোষটা সম্পূর্ণ নিলয়ের। একদিন এক স্মার্ট ফোন কিনে এনে ফেস বুক হোয়াটস আপ ইত্যাদি করে দিয়ে যেন গ্লানিমুক্ত হতে চাইলো নিলয় –

– "তুমি তো লিখতে পূর্বা। এখন সংসারের এতো চাপ। মাঝে মাঝে এখানে লিখো। মন ভালো লাগবে।"

খেলার মতো করে যেটা শুরু হলো, ক্রমশঃ তা দাঁড়িয়ে গেল নেশায়। দেখলো কিছু লোক নিয়মিত তার লেখা পড়ে। সেই সঙ্গে মন্তব্যও করে। সে একেবারে আপ্লুত হয়ে গেলো। যতই সে সুন্দর করে সংসার করুক না কেন, মনের মধ্যে কোথাও তো ফাঁক ছিল।

"কিছু তো আমিও করতে পারতাম। করলাম না তোমাদের জন্য !" এই বাজে ভাবনা অতি সচেতন ভাবে পূর্বা এড়িয়ে চলেছে। যার জন্য ঝগড়া হয় খুব কম। মেয়ে খুব শান্ত, পড়াশুনোতে ও ঠিকঠাক, বাড়ির এই পরিবেশ অনেকটাই দায়ী তার জন্য। অথচ লিখতে শুরু করতেই, বাইরের ঐ স্তুতি তার ভেতরে যেন একটা তোলপাড় ঘটিয়ে দিলো। এতটুকু সংযম না হারিয়েও সে বারান্দায় টবে রাখা সবুজ পাতাবাহার আদর করলো। আকাশের দিকে তাকিয়ে ফিক করে হাসলো। অপূর্ব রান্না করে ফেললো। শাশুড়ির সঙ্গে নানা গল্প করে, রাত জেগে লিখে ফেললো সুন্দর এক লেখা।

ফেসবুকে পোস্ট করতেই উড়ে এলো নানা মন্তব্য। খুব উত্তেজিত হয়ে নিলয়কে দেখাতে নিয়ে গেলো। আগের গুলো যেমন তেমন কিন্তু এই লেখাটা তার নিজেরও খুব ভালো লেগেছে। নিলয় খুব ভদ্র ভাবে বললো –

"রাতে পড়ে নেবো।" তারপর পূর্বার থুতনী নেড়ে আদর করে বললো –

"চিন্তা নেই। তুমি এত সুন্দর যে তোমার ছবি দেখেই সব ফিদা হয়ে যাবে। কমেন্টস তুমি পাবেই।"

পূর্বা এতো অপমানিত এতো দুঃখিত এতো অসহায় বোধ করেছিল সেদিন, তার মনে হয়েছিলো জীবনের সেরা উনিশটি বছর সে এই সংসারকে নিজের ভেবে সব কিছু দিয়ে দিয়েছে, তার মেধা, তার বুদ্ধি, শিক্ষার জন্য এ এক অনন্য সংসার তৈরী হয়েছে, সে ভাবতো সবাই বোধহয় এটাই ভাবে যে পূর্বা সব পারে। সবাই বোধহয় মাথায় করে রাখে তাকে। আজ ঐ একটি কথা শপাং করে আছড়ে পড়লো এতদিনের বিশ্বাসের গায়ে। গল্পটা পড়লোনা পর্যন্ত ! বলে

বসলো সে সুন্দরী বলে তার কতগুলো স্তাবক জুটেছে ? তার মেধা বলে কিছু নেই ? লেখার কোনো ক্ষমতা নেই ? সেদিনই প্রথম মেসেজ এলো ইনবক্সে। দেখতে আর কিছু ইচ্ছে করছিল না। তবু নাম দেখে চমকে উঠলো। ফেস বুকে তার সবচেয়ে প্রিয় লেখকের নাম জ্বল জ্বল করছে। বাঁ হাতের চেটো দিয়ে চোখের জল মুছে মেসেজ খুললো

"আপনার লেখার হাত ভালো। কিন্তু শব্দ ব্যবহার ঠিক করে নেবেন একটু।"

আহা ! আহা ! বসন্তের বাতাস উড়ে এলো তাপিত হৃদয়ে। ফোন নয়, যেন বীণা হাতে ঘুরে এক পাক নেচে নিলো পূর্বা। মনে পড়লো, খুব ভয়ে ভয়ে বন্ধুত্বের অনুরোধ পাঠিয়েছিল ওনাকে। উনি স্বীকার করে নিয়েছিলেন পূর্বাকে। তার বেশী কিছু নয়। এমন কি পূর্বার লেখা পড়েন কিনা তাও বোঝা যায় না। এখন বুঝলো পড়েন। কোথায় একটা শান্তি এলো মনে। কোথায় একটা স্বীকৃতি। তার সুন্দর মুখের জন্য নয়, ওনার সুন্দরী পাঠিকার অভাব নেই, তার লেখাকে তারিফ করেছেন উনি। পূর্বা ঠিক করলো দরকার নেই কাউকে এই কথা বলার। শুধু বুকের ভেতর এক হাওয়া মহলের অস্তিত্ব টের পেল যেন। তারপর থেকে আজ একমাস এই ভাবে নিরন্তর নিজেকে তৈরী করে চলেছে একটু একটু করে। যার ইতিহাস জানে সে নিজে আর দিনের শেষে আসা ঐ মেসেজ। অথচ কিছুই থাকেনা তেমন লেখা। কুশল প্রশ্নের পরেই খুব শান্ত ভাবে তার লেখার কথা বলা। ত্রুটি ধরিয়ে দেওয়া এই রকম। কিন্তু আসবেই। ভুল হবে না কখনো।

বইমেলাতে দূর থেকে দেখেছিল পূর্বা। কম বয়েস। তবু সমীহ জাগে। পূর্বার মনে হয়েছিলো এই মানুষটার মধ্যে একটা নদী লুকিয়ে আছে। কলকল সেই জলধারা বইছে আপাতঃ শান্ত কবির অন্তরে। শুদ্ধ পবিত্র এক নদী। ভীড়ের মধ্যে চুপ করে দাঁড়িয়ে ওনার বলা কথা গুলো শুনছিলো –

"কবিরা একজন সাধারণ সংসারী মানুষের মতো বইকি। লোভ রাগ কাম সব থেকেও অন্তরে যিনি উদাসীন প্রেমিক বা নিষ্ঠুর সন্ন্যাসী তিনিই কবি।"

*****

নিলয় একটু অবাক হচ্ছে। নিখুঁত চলছে সংসার। কিন্তু কোথায় যেন ছন্দপতন ঘটছে খুব সূক্ষ্ম ভাবে। মাঝে মাঝে অফিস থেকে বাড়ী ফিরছে, দরজা খুলছে মায়ের আয়া। মেয়ে পড়তে পড়তে উঠে কফি এনে দিলো কোনোদিন। প্রিয় রান্না গুলো নিজেকে গরম করে খেতে হলো একদিন। পূর্বা বাড়ি নেই, সে সাহিত্যসভাতে যাবে, এ সংবাদ জানা সত্ত্বেও কোথায় কাঁটা বিঁধছে। কি এমন লেখে যার জন্য সাহিত্যসভায় যেতে হবে ? তাও আবার সন্ধ্যেবেলা ? মেয়ের পরীক্ষা, মা আছেন বাড়িতে, তারপরে সে আসছে অফিস থেকে – সব ফেলে সাহিত্যসভা ? বাবার ভুরু কুঁচকানো গম্ভীর মুখ দেখে মেয়ে বললো –

"মা তো সপ্তাহে দু দিনের বেশী কোথাও যায়না।"

নিলয় মনের ভাব গোপণ করার কোনো চেষ্টা করলো না। বিরক্তি দেখিয়ে বললো –

"এখন তোমার জীবনের একটা বড়ো পরীক্ষা মুনমুন। দু দিন পরে বেরোতে পারতো !"

– "সে আর ভেবে কি হবে বাবা ! মা এখন লেখিকা বলে কথা ! চলো আমরা ডিনার করে নি। মা চলে আসবে নটার মধ্যে !"

ভেতরটা কেমন চিড় বিড় করছিলো নিলয়ের। বাড়ি মানে পূর্বা, প্রিয় ধূপের গন্ধ, খাবার সাজানো, দৌড়ে দৌড়ে জল দেওয়া, গানের কলি গেয়ে ওঠা আরো কত কি ! শালার ফেসবুক হয়ে বৌ গুলোর দেমাক দেখো একবার! ধুর। খুব

মুড অফ নিয়ে নিজের ঘরে কাজ করতে চলে গেলো নিলয়। টেবিল ভর্তি হয়ে পড়ে রইলো এঁটো বাসন, মাছি আর কিছু অবসাদ।

*****

একরাশ আনন্দ নিয়ে কবিতা আসর শেষ হয়। পূর্বার ভেতর চাপা পড়ে থাকা কবিতা ঝর্ণার উৎসমুখ আরো খুলে যায় যখন এমন আসরে আসতে পারে। রবীন্দ্র সদন থেকে ফিরতে বেশ প্রবলেম। তার উপরে মেয়ের পরীক্ষার চিন্তা নিয়ে বেশ দৌড়েই বাসে উঠে বাড়ী আসে অনেকটা কলেজ জীবনের মতো। না ! কোনো অপরাধ বোধে ভোগেনা পূর্বা। তাহলে আনন্দ তাকে আর স্পর্শ করবে না। কবি মেসেজে লেখেন –

"তুমি নিজের কাছে পরিষ্কার থাকবে। জীবন কোনো শর্তের সমষ্টি নয়। আবার জীবন মানে উশৃংখলতাও নয়। জীবন হলো ব্যালান্স। মনজগৎ আর বাইরের জগতের মধ্যে এক সুন্দর সেতু তৈরী করতে হয় প্রতিদিন !"

পূর্বার মনে পড়ে সেই ছোটবেলাকার কথা। বাবা মাথায় হাত বোলাতেন। বলতেন –

"নিজের আত্মাকে বিক্রি করে কাউকে সুখী করতে যেয়োনা মা। নিজেকে ঠকালে অন্যকে সেবা করার মধ্যে ফাঁকি থেকে যাবে।"

বাবার আফসোসের কারণ ছিল মেজোকাকীমা। কাকিমার তিরিশ বছরে কাকু মারা যান। চমৎকার গান গাইতেন কাকীমা। বর্ষা গ্রীষ্ম শীতের কত অবসরে পরিবার একসঙ্গে বসতো চা মুড়ি নিয়ে। আড্ডার সঙ্গে কাকিমার গলায় অপূর্ব রবীন্দ্রসংগীত –

দুটো মিলে সময় থমকে যেত সুন্দর হয়ে। কাকা হঠাৎ চলে যাবার পরে কাকীমা কেমন বোবা হয়ে গেলো। আমিষ খাবে না, সাদা শাড়ি আর গান ? সে তো অচ্ছুৎ হয়ে গেলো ! পাড়ার লোক আত্মীয় স্বজন ধন্য ধন্য। এমন নিয়ম মানছে এতো কম বয়েসে কাকীমা ! সবার আদর্শ হওয়া উচিত। শুধু বাবা মুখ ভার করে রইলেন। শ্বাস ফেলে বললেন – "নিজেকে বঞ্চিত করে স্বামীর প্রতি ভালোবাসা দেখিয়ে পরে নিজেকেই আর খুঁজে পাবে না তোর কাকীমা ! পরে দেখবি বাথরুমে লুকিয়ে গান গাইবে !"

*****

কবির মেসেজ গুলো খুব অদ্ভুত –

– "পূর্বা। আজ রাতে নিজের মন ছুঁয়ে দেখো।" কিংবা এক আদেশ – "যে রান্নাগুলো করলে তার ছবি তুলে রাখো !" আরো অদ্ভুত মেসেজও আসে –

"লেখার চেয়েও বেশী দেখো। শোনো। পড়ো। ভাবো। আর যেটা ভাবছো সেটা লেখো ! সবচেয়ে বেশি লেখো নিজের সম্পর্কে। তুমি কে পূর্বা ? তুমি কে ?"

আকাশে বাতাসে বাজে ঐ কথা তুমি কে ? পূর্বা ? তুমি কে ? সারাদিন কাজ করে। দ্বিগুণ উৎসাহে গাছে জল দেয়, মেয়ে স্বামী শাশুড়ীর যত্ন বাড়িয়ে দেয়। রাতে ফোন খুলে দেখে ঠিক এসেছে মেসেজ –

"আজকের লেখাটাতে ছন্দ গড়বড় আছে। তবে শব্দ গুলো অসাধারণ। নিরালা বিকেল, একলা পুকুর, আকাশে এক আশ্চর্য চাঁদ – বাঃ। পূর্বা। মন ছুঁয়ে গেলো ! আরো লেখো। তোমার কবিতার সেতু বেয়ে আমি আমার প্রিয় সময় ছুঁতে পারি।"

উদাস বসে থাকে পূর্বা। রাত বাড়ে। নিলয়ের ঘরে লাইট নিভে যায়। মুনমুনকে হরলিক্স দেবার সময় পেরিয়ে যায়। অনেক ভোরে উঠতে হয় তাকে। আজ আর কোনো হিসেবে মন দিতে ইচ্ছে করছে না। চৈত্রের দামাল হাওয়া বারান্দা ছুঁয়ে তার চুলে খেলা করে। সব মানুষ বাস করে দুটি আলাদা রূপ সঙ্গে করে। যা সে দেখায় তা সে নয়। আসল নকল দুটো মিলে মিশে একাকার হয়ে হাঁসজারু মানুষ ঘুরে বেড়ায় সমাজের মধ্যে।

তুমি কে ? তুমি কে ? নিরন্তর এই প্রশ্নের মুখে দাঁড়ালে দেখা যায় হয়ত নিজেকে। নাহলে মনে হয়, কিনারায় বসে আছি। দু পাশে শূন্যের গূঢ় খাদ হাতছানি দেয়। দূর থেকে ভেসে আসে নক্ষত্রের স্বর। সুবিস্তৃত শালবন ধুলোর পাহাড় পেরিয়ে হেঁটে যেতে চায় সে। সংশয়ে নয়, সমস্ত খোঁজার শেষে নিজেকে খুঁজেই বাঁচতে চায় মানুষ। সমাজের পরিচয় থাক পড়ে খোলসের মতো। হয়তো অহেতুক সব, তবু আজ থেকে শুরু হোক নিরন্তর সন্ধান।

## ইন্দিরা চন্দ

# লাট্টু

“এটা কোনদিক দিয়ে নিয়ে যাচ্ছো ভাই ? আমার কিন্তু তাড়া আছে !” অবনী চারিদিক দেখতে দেখতে রিক্সাওয়ালার দিকে কথাটা ছুঁড়ে দিলো। “এটাই তো শর্ট কাট বাবু, এই লাল বাড়ীর পাশ দিয়ে। আসলে এই লাল বাড়ীর পাশ দিয়ে রাতে কেউ যায় না, পোড়ো বাড়ী, ভুতের ভয়, হে ! হে ! হে ! ... “বহু বছর পর এই বছর পর পর দুবার পিসিমণির বাড়ী আসা হলো। ৮৪ সালের পর আসার ইচ্ছা থাকলেও হয়ে ওঠেনি। গত মাসে বাবা, শ্রীতমা আর মেয়ে শ্রাবণী কে নিয়ে এসেছিল অবনী। সেই শেষ দেখা হলো পিসিমণির সাথে। এবার একাই এসেছে, পিসিমণির শেষ কাজে। “এই যে বাবু বাঁ দিকে লাল বাড়ী, শুনেছি এক সময় নাকি রম রম করতো এই বাড়ী, এখন কি অবস্থা দেখুন, সব ভেঙে চুরে একাকার।” রিক্সা চালক ছেলেটি আঙ্গুল দিয়ে দেখালো। “এই এই একটু দাঁড়াও তো !” বলতে বলতেই এক লাফে রিক্সা থেকে নেমে গেলো অবনী। জং ধরা লোহার গেট খুলে অবনী বাড়িতে ঢোকার সাথে সাথে হুড়মুড়িয়ে ছোটবেলার সব স্মৃতি চোখের সামনে সিনেমার মতো ভেসে উঠলো। বাগানের মাঝখানে ভাঙা ফোয়ারার চারপাশের ফাটল ধরা চাতালে সে নিজেকে দেখতে পেল, পায়ের কাছে লাট্টুটা ঘুরছে আর তার পাশে দিবাকর, দু হাতে তালি দিতে দিতে বলছে “সূর্যের চারিদিকে পৃথিবী ঘুরছে, আমি দিবাকর, আর তুই অবনী, কেমন মিলে যাচ্ছে দেখ !” হঠাৎ রিক্সা চালক ছেলেটির ডাকে সম্বিৎ ফিরল অবনীর। গেট পেরিয়ে রিক্সায় উঠে পিসিমণির বাড়িতে যখন পৌঁছালো তখন সূর্য অস্ত গেছে, বিষণ্ন সন্ধ্যায় পাখিদের কোলাহল, শাঁখের আওয়াজ ,আর মনের মাঝে দিবাকরের সেই হাসি মিলেমিশে এক হয়ে যাচ্ছে।

মা মারা গেলো যখন অবনীর তখন ১০ বছর বয়স। পিসিমণি জোর করে নিয়ে এসেছিল এ বাড়ীতে, এখানেই স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছিল। শিয়ালদহের বাড়ীতে তখন শুধু দাদু আর ব্রজ কাকু, দাদুর একটুও ইচ্ছা ছিল না আদরের নাতী কে কাছ ছাড়া করবার। বাবার বদলির চাকরী, মাসের মধ্যে ৩/৪দিন বাড়ীতে আসেন, “ছেলে একেবারে আদরে বাঁদর তৈরী হবে !” পিসিমণি দাদু কে বলেছিল। কলকাতার নাম করা স্কুল থেকে মফস্বলের এই স্কুলের পরিবেশ একেবারে আলাদা ছিল। বন্ধু হতে অনেক সময় লেগেছিল অবনীর। প্রথম বন্ধু এই দিবাকর। সেদিন স্কুলের পরে দিবাকর অবনী কে ওদের বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিলো। মনে পড়লো দিবাকরের মা খুব যত্ন করে খাবার বেড়ে দিয়েছিলেন। কিছুতেই চেহারাটা মনে পড়ছে না অবনীর, শুধু শাঁখা পলা পড়া গোল গোল হাত দুটো চোখের সামনে ভেসে উঠছে। মনে আছে ক্লাসে কেউ দিবাকরের সাথে খেলতো না, বরং নানা ভাবে ওকে উত্যক্ত করতো। তখন বোঝেনি অবনী এখন ভাবে দিবাকর হয়তো অটিস্টিক ছিল, বা ওর কোনো intellectual disability ছিল। উঁচু ক্লাসে যখন অবনী ফার্স্ট বয় তখন তার আরো কত বন্ধু। দিবাকরের বন্ধুত্ব তার আর ভালো লাগতো না। দিবাকরের বাড়িতে কিন্তু তখনও যেত অবনী, তবে দিবাকরের জন্য না, ঐ শাঁখা পলা পরা কাকিমার হাত দুটোর সাথে মায়ের মিল পেতো। দিবাকর কিন্তু একই ভাবে খুশি হতো, ঘরে বসে হাতের উপর লাট্টু ঘোরাতে ঘোরাতে বলতো, “অবনী তুই ঘুরে ঘুরে পৃথিবী দেখিস, আমার তো উপায় নেই, আমি তো স্থির”, বলে জোরে হেসে উঠতো।

রাতে বিছানায় শুয়ে ঘুম আসছে না অবনীর। সারাদিন অনেক ধকল গেছে। পিসিমণির কাজে সে বাড়ির ছেলের দায়িত্ব পালন করেছে। পিসিমণির সাথে তার মায়ের কোন মিল না থাকলেও পিসিমণিই তাকে মায়ের মতো আগলে বড় করেছে। এই বাড়িতে না আসা হলেও বছরে দুবার কলকাতার বাড়িতে পিসিমণি অলকাকে নিয়ে আসতো তখন সবাই এক সাথে হই চই করে সময় কাটাতো। অলকা ওরফে অলি, পিসিমণির মেয়ে আর অবনী দুই ভাই বোনের মতো বড় হয়েছে। পিসিমণির শাসন আর পিসানের প্রশ্রয়ে বাবা মা র অভাব কোনদিন টের পায়নি অবনী।

পিসানের মৃত্যুর সময় সে দেশে ছিল না, তাই আসতে পারেনি। তাই এবারে সে সব কিছু নিজে হাতে করেছে। অলি আর ওর বর অম্বরীশ ওর কথা মতই সব পালন করেছে। কাল নিয়ম ভঙ্গ, ভোরে ক্যাটারারের লোকের সাথে পিসিমণির পছন্দের ইলিশ আনতে যাবার কথা। পাশ ফিরে সাইড টেবিলে মোবাইলে সময়টা দেখল অবনী, দেড়টা, এখন না ঘুমালে, কাল ৬ টায় বেরোবে কি করে ? কিন্তু দিবাকরের সেই হাসি, চোখের দৃষ্টি আর গলার স্বর কানে বাজছে। রাতে খাবার টেবিলে অলি বললো দিবাকর নাকি বছর পাঁচেক আগে মারা গেছে। মারা যাবার আগে তার নাকি খুব খারাপ অবস্থা ছিল, কেউ দেখার ছিলো না, টাকা পয়সা প্রায় কিছুই ছিল না। অলি বলছিলো, দিবাকরের দিদি চেয়েছিলো ওকে কলকাতা নিয়ে যেতে, দিবাকর নাকি যেতে চাইনি, ও নাকি বলেছে ঐ বাড়িতে ওকে থাকতেই হবে, কোথাও যেতে পারবে না। বুকের বাঁদিকটা চিন চিন করছে, কেন যেন একটা অপরাধ বোধ ধীরে ধীরে সরীসৃপের মতো সেখানে প্রবেশ করছে, বড় অস্থির লাগছে অবনীর। বিছানা ছেড়ে জানলার কাছে এসে দাঁড়ালো অবনী।

আজ রাতে আর ঘুম আসবে না তার। খুব সাবধানে সদর দরজা খুলে রাস্তায় নেমে নিজের অজান্তেই দিবাকরের বাড়ীর দিকে চলল অবনী। গেট খুলে একটু এগোতেই অন্ধকার ঘিরে ধরলো তাকে। আকাশে কি মেঘ করেছে ? ওপরে তাকিয়ে আকাশে একটা তারাও দেখতে পেলো না অবনী। মোবাইলের টর্চ জ্বালিয়ে ভাঙা দরজা পেরিয়ে ঢুকে আচ্ছন্নের মতো কোনদিকে না তাকিয়ে এবড়ো খেবড়ো সিঁড়ি বেয়ে দিবাকরের ঘরের মাঝে এসে দাঁড়ালো। ঘরে কোন আসবাব নেই, পূবদিকের জানলার পাল্লাটা বোধহয় ভেঙে বাইরে ঝুলছে, সেখান থেকে একটা খড় খড় আওয়াজ আসছে, দেওয়ালের বই এর তাকে সামান্য কিছু কাগজ, একটা গ্লাস, কয়েকটা বই, সব ধুলোয় ঢাকা, দেওয়াল আলমারির কাঠের পাল্লার অর্ধেকটা উঁইয়ে খেয়ে নিয়েছে, অন্য পাল্লাটা হাট করে খোলা। হঠাৎ একটা সর সর আওয়াজে চমকে লাফ দিলো অবনী, মনে হলো ঘরে যে সামান্য কিছু জিনিস আছে সব যেন জীবন্ত, এক দৃষ্টিতে অবনীর দিকে তাকিয়ে আছে। কেমন গা ছম ছম করে উঠল অবনীর। নিজের এই বোকামো তে নিজের ওপরেই রাগ হলো। এই রকম অতি আবেগে ভেসে গিয়ে কোন কাজ করা একেবারেই তার স্বভাব বিরুদ্ধ। আজ কি যে হলো তার, দরজার দিকে পা বাড়াতেই যাবে এমন সময় আলমারীর ভিতর থেকে কি একটা বেরিয়ে জানালার দিকে চলে গেল। বাইরের আলোয় যত টুকু দেখা যায় মনে হল ইঁদুর, টর্চের আলো আলমারীর দিকে করতে আরো কিছু ছোট ছোট লাল চোখ চক চক করে উঠল, একটু হকচকিয়েও গেল বোধহয় হঠাৎ অবনীর উপস্থিতিতে। কিন্তু ঐটা কি ? একটা টিনের বাক্স মনে হলো। কাছে গিয়ে অবনী চিনতে পারলো ঐ টিনের বাক্সটা দিবাকরের প্রাণ ছিল। সব প্রিয় জিনিস ও ওখানে জমিয়ে রাখতো। একটু চাপ দিয়ে ডালাটা খুলতেই অবনী দেখল ওটার মধ্যে একটা লাট্টু আর অনেক পুরানো একটা ছেঁড়া বই এর পাতা। মোবাইলের আলোয় ঐ পাতার ছবি চিনতে অবনীর অসুবিধা হলো না একটুও, এ তো সেই ক্লাস সিক্সের ভুগোল বই এর পাতা যাতে সৌরমণ্ডল ছবিতে বোঝানো আছে ...

কৃষ্ণা গুপ্ত

# কনকলতা

দোকানটির নামটি বেশ। 'কনকলতা'। ছোট্ট একচিলতে দোকান। সুন্দর ক'রে সাজানো, বেশ ঝকঝকে। কলকাতায় আমার বাড়ির কাছেই দোকানটি, একই কমপ্লেক্সের মধ্যে। আর দোকান-দারটিও ভারী অমায়িক। বয়স বছর পঞ্চান্ন থেকে ষাট। বেশ হাসিখুশি, শ্যামবর্ণ, দোহারা চেহারার।

এই দোকানে আমি প্রায়ই জিনিস কিনতে আসি। কমপ্লেক্সের অনেক দোকানের মধ্যে এটি একটি। কনকলতার সামনের দোকানটি 'বালাজির দোকান' বলে পরিচিত। সেটি প্রধানত মুদির দোকান, খুব চলে। আর কনকলতা মণিহারী জিনিসের দোকান; শৌখিন, রকমারি জিনিসে ভরা। এই দোকানও খরিদ্দারে সরগরম থাকে সবসময়। সেখানে কী না পাওয়া যায়! আলতা, চিরুনি, চুলের ফিতে, টিপ, কাজল, ফেস ক্রিম, পাউডার, নানান সাবান ইত্যাদি তো আছেই। তাছাড়া, বালতি, মগ, ঘর মোছার মপ এবং এধরণের নানা জিনিসের সম্ভার আছে সেখানে। ধীরে ধীরে এই দোকানের মালিকের সাথেও বেশ আলাপ হয়ে গেছে আমার। দোকানে গেলেই হেসে বলেন, 'দিদিমণি, কী কিনবেন বলুন!' কেনা হয়ে গেলে কর্মচারীকে হাঁক দিয়ে বলেন, 'ওরে, দিদিমণির জিনিসগুলো ভাল ক'রে প্যাক ক'রে দে !'

এইভাবেই দুই-তিন বছর কেটে গেছে। এইখানে আমার পরিচয়টা ছোট্ট করে জানিয়ে রাখি। আমরা প্রবাসী বাঙালী, দিল্লিতে থাকি। ওখানেই আমার কর্তা একটি বেসরকারি অফিসে কর্মরত। আমাদের দুই ছেলেমেয়ে, তারা স্কুলে পড়ে। আমরা বছরের শেষে একবার অন্তত কলকাতা ঘুরে আসি। সম্ভব হলে, বছরে দুইবার।

এবার নানান কারণে দেরী হয়ে গেল। দেড় বছর পর কলকাতায় এলাম। কনকলতায় যথারীতি খুব ভিড়। অনেকেই এই দোকানে আসেন, কারণ এখানে অনেক জিনিস সহজেই মেলে আর তাদের দামও বেশ কম। ভদ্রলোকটি মাঝে মাঝে দোকানে বসেন না। তখন অন্য একজন দোকান সামলান। এক বিবাহিতা মহিলাকেও মাঝে মধ্যে ওখানে বসতে দেখি। ভদ্রলোকটির স্ত্রী হবেন বোধহয় ! দোকানদারটিকে এখানে ওখানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। কখনও অন্য দোকানীদের সাথে গল্পগাছা করেন, কখনও বা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সিগারেট খান। ওঁর বেশ শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে, মনে হয়। কারণ, উনি রীতিমতো মেদবহুল হয়েছেন আর মুখটাও গেছে ফুলে।

এবার কলকাতায় আসার পর দু-তিনবার এই দোকানে যাতায়াত হলো। তারপর, বেশ কিছুদিন বাদে একদিন দোকানে গেলাম। দেখি, মহিলাটি সব তদারক করছেন। কিছু কিছু জিনিস কিনলাম। সব কিছুরই দাম বেড়ে গেছে। বললাম, 'এখন তো প্রতিদিনই দাম লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। কিছুদিন আগেই আপনার স্বামীর কাছ থেকে এই জিনিসগুলো কিনেছি। তখন দাম অনেক কম ছিল। তা, উনি কোথায় ? আজ বুঝি দোকানে আসেন নি?' ভদ্রমহিলা গম্ভীর ভাবে বললেন, 'উনি আমার দাদা, স্বামী নন। ওঁর জায়গায় আমি মাঝে মাঝে দোকানে বসি। তবে – দাদা আর আসবেন না।' হেসে বললাম, 'কেন, আসবেন না ? উনি রিটায়ার করলেন নাকি ?' মহিলাটি একটু চুপ করে থাকলেন। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, 'না, তা নয়। আমার দাদা কয়েকদিন আগে মারা গেছেন।'

হঠাৎ যেন বজ্রপাত হলো ! কিছুক্ষণ স্তব্ধ, স্তম্ভিত থেকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কিন্তু, এই সেদিনও তো ওঁর থেকে জিনিসপত্র কিনলাম! উনিই তো বেশীর ভাগ সময়ে দোকানে বসতেন, তাই না ? আপনি কার কথা বলছেন, ঠিক বুঝতে পারছি না!' সংশয় যাচ্ছিল না কারণ ভদ্রলোকটির নামটাই জানিনা। তাছাড়া, অন্য একজনকেও দোকানে বসতে

দেখেছি। মহিলাটি অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, 'হ্যাঁ, দাদাই বেশীর ভাগ সময়ে দোকানে থাকতেন। দিন দশেক আগে মাঝরাতে ওঁর হঠাৎ ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটাক হয়। অ্যাম্বুলেন্সে করে হাসপাতালে নেওয়ার পথেই দাদা শেষ হয়ে যান।' পেছন থেকে একজন ক্রেতা বলে উঠলেন, 'ভাগ্যিস, ভদ্রলোকের ফ্যামিলি ছিল না। নইলে, কী যে হতো!' বিশ্বাস হচ্ছিল না। হয়তো কোথাও বুঝতে ভুল হচ্ছে। হয়তো যিনি মারা গেছেন, তিনি অন্য কেউ। মনের কোণে এক ক্ষীণ আশা উঁকি মারছিল, হয়তো সত্যিই তিনি অন্য লোক!

প্রায় অচেনা, অজানা সেই লোকটির জন্য আমার মন ব্যথিত হয়ে উঠল। দুঃখিত, ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বাড়ি ফিরলাম। কয়েকদিন পর নিশ্চিত জানতে পারলাম যে আমার আশঙ্কাই সত্যি। ওই দোকানের মালিক, নিমাইবাবু, সত্যিই মারা গেছেন হার্ট অ্যাটাকে।

এই ঘটনাটা আমার মনে গভীর রেখাপাত করল। জীবনটা এতটাই ঠুনকো! আলো-হাসি ভরা পৃথিবীর কালো হতে লাগে এক মুহূর্ত! তবে কিসের জন্য মানুষের এত লোভ, হিংসা আর হানাহানি!

এরপর কনকলতা বেশ কিছুদিন বন্ধ রইল। আমি ওদিকে গেলে বন্ধ দোকানটার দিকে তাকিয়ে থাকতাম। মনে হতো, এই বুঝি দোকানের ঝাঁপ উঠে যাবে। আলো ঝলমলে দোকান থেকে হাসতে হাসতে বেরিয়ে আসবেন ভদ্রলোকটি। আর আমাকে দেখে বলবেন, 'আসুন দিদিমণি, কী কিনবেন বলুন !'

রমা জোয়ারদার

# প্যান্ডেলের ঠাকমা

লাঠি ঠুকঠুক করে ধীরে ধীরে হেঁটে সুপ্রীতি পুজো প্যান্ডেলে ঢুকল। ষাটোর্ধ্ব প্রবীনদের আবাসনের পুজো। প্রায় সকলেই সকলকে চেনে। সে সোজা একেবারে সামনে, পুজোর জায়গায় এগিয়ে গেল। ওখানে অল্প ক'টা চেয়ার রাখা আছে – সবই ভর্তি! একদিকে ঢাকী তার ঢাক সামনে নিয়ে একটা চেয়ারে বসে আছে। তার পাশের চেয়ারে একটা বাচ্চা ছেলে বসে আছে। তার হাতে একটা কাঁসর ঘন্টা। একজন ভলান্টিয়ার এসে বাচ্চা টাকে উঠিয়ে দিয়ে সুপ্রীতির দিকে চেয়ার ঠেলে দিয়ে বললো – "বসুন ! আপনি এখানে বসুন।" বাচ্চাটা আহত, অভিমানী দৃষ্টিতে সুপ্রীতির দিকে তাকিয়ে দেখল, তারপর ঢাকীর চেয়ারের পিছনে গিয়ে দাঁড়ালো। ছেলেটিকে এভাবে উঠিয়ে দিয়ে সেখানে বসতে সুপ্রীতির বেশ খারাপ লাগছিল। কিন্তু বেশিক্ষণ দাঁড়াবার ক্ষমতা তার নেই। তাই একটু কিন্তু কিন্তু করে সে চেয়ারটায় বসে পড়ল। বাচ্চা ছেলেটার দিকে তাকিয়ে স্নেহের হাসি হাসল। বাচ্চাটা চোখ নামিয়ে নিল। প্রতিমার সামনে বসে পুরুতঠাকুর পুজো করছিলেন। ধূপ আর ধুনুচির ধোঁয়ায় পুজোর জায়গাটা ভরে গেছে। একটানা সঙ্গীতময় সংস্কৃত মন্ত্রোচ্চারণ, দুর্গা ঠাকুরের অদ্ভুত সুন্দর দুটি চোখের দৃষ্টি আর মুখের হাসি – সব মিলে যেন এক সম্মোহনী পরিবেশ ! সবাই চুপচাপ বসে ছিল। মন্ত্রোচ্চারণ থামতে সুপ্রীতির আচ্ছন্ন ভাবটা কেটে গেল। এদিকে ওদিকে তাকাতেই তার নজরে পড়ল বাচ্চা ছেলেটা ঢাকীর চেয়ারের পিছনে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে!

এমন সময় আরতি শুরু হল। ঢাকী উঠে দাঁড়িয়ে ঢাক বাজাতে শুরু করল। সঙ্গে সঙ্গে চেয়ারের পিছনে ঘুমন্ত ছেলেটা তড়াক করে দাঁড়িয়ে পড়ে পূর্ণোদ্যমে কাঁসর বাজাতে আরম্ভ করল। পুরো ব্যাপারটার মধ্যে এমন একটা চমক আর মজা ছিল যে শুধু সুপ্রীতি নয়, ওখানে বসে থাকা আরো অনেকে হেসে উঠল। বাচ্চাটা নির্বিকার ! কিছু বুঝল বলে মনে হল না। পর দিন অষ্টমী ! সন্ধিপুজোর পাট মিটতে বিকেল হয়ে গেল। পুজোর পর সুপ্রীতি আর রুমা প্যান্ডেলে বসে গল্প করছিল। দুর্গাপুজো উপলক্ষে একজন চাওয়ালা বসানো হয়েছে। তার কাছে সবসময় চা পাওয়া যাচ্ছে। দুই বন্ধুর হাতে গরম চা-এর কাগজের গেলাস। গেলাসগুলো একেবারে মাথা পর্যন্ত ভর্তি বলে দুজনেই রুমাল জড়িয়ে ধরে আছে ! প্যান্ডেল এখন ফাঁকা ফাঁকা। ঢাকী এক কোনে বিশ্রাম নিচ্ছে।

আবাসনের গেটের  বাইরে একটা আইসক্রিমওয়ালাকে ঘিরে কয়েকটি ছোট ছেলেমেয়ে আইসক্রিম কিনছে। কথা বলতে বলতেই সুপ্রীতির নজরে পড়ল ওদের থেকে একটু তফাতে সেই কাঁসর বাজানো বাচ্চা ছেলেটা আইসক্রিমওয়ালার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ছেলেটাকে ডেকে সে জিজ্ঞাসা করল – "কিরে, আইসক্রিম খাবি ?" ছেলেটা মাথা নেড়ে 'না' বলল ! সুপ্রীতি আর রুমা দুজনেই একটু অবাক হয়ে কারণ জিজ্ঞাসা করতে সে বলল – "টাকা নেই!"

– "আমি টাকা দিচ্ছি। তুই যা, গিয়ে আইসক্রিম কিনে আন !" কথা বলতে বলতেই সুপ্রীতি তার হাতের পার্স খুলল।

বাচ্চাটা কিন্তু কোনো রকম উৎসাহ দেখালো না। হাত গুটিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল !

– "কি রে ? কি হল তোর ?" এবার রুমা প্রশ্ন করল।

একই ভাবে দাঁড়িয়ে ছেলেটা উত্তর দিল – "আমি ভিক্ষা নেবো না !"

চমকে উঠল দুই বন্ধু। একটু যেন থতমত খেয়ে গেল। সামলে নিয়ে সুপ্রীতিই আবার বলল – "এমা ! ভিক্ষা কেন হবে ? তুই আমাদের জন্য একটা কাজ করে দিবি, আর তার বদলে আমরা তোকে আইসক্রিম খাওয়াবো।"

ছেলেটা একটু সন্দিহান দৃষ্টিতে চেয়ে বলল – "কি কাজ ?"

– "দ্যাখ, আমাদেরও খুব আইসক্রিম খেতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু কে এনে দেবে, বল ?"

– "আর দেখতেই তো পাচ্ছিস, আমাদের পায়ে কত ব্যথা। হাঁটতে খুব কষ্ট!" রুমা কথাটা বলে করুণ চোখে তাকিয়ে রইল।

– "তাই তাইতো বলছি, তুই আমাদের জন্য আইসক্রিম নিয়ে আয়, আর তোর নিজের জন্যেও পছন্দমতো আইসক্রিম নিবি! তার পর আমরা তিনজন একসাথে মজা করে আইসক্রিম খাবো !"

– ছেলেটা এবার রাজী হয়ে গেল। হাসিমুখে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল – "দাও, টাকাটা দাও। তোমরা কি নেবে, বল।"

প্যান্ডেলে তিনটে চেয়ারে বসে আইসক্রিম খেতে খেতে ওরা তিনজন গল্প করছিল। সুপ্রীতি আর রুমার হাতে ভ্যানিলা আইসক্রিম কাপ, আর বাচ্চাটার দুহাতে দুটো কাঠি আইসক্রিম। একবার এহাতেরটা চুষছে, একবার ওহাতেরটা চাটছে। দারুন খুশি সে! দিব্যি ভাব হয়ে গেছে তিনজনের। বাচ্চাটার নাম বিদুর।

– "বিদুর ! এ নামটা তো বড় একটা শুনিনা! কে রেখেছিল ?" রুমা প্রশ্ন করাতে ছেলেটা উত্তর দিল – "আমাদের গ্রামের মাস্টার দাদু !"

– "তোদের গ্রামের নাম কি?"

– "ন'পাড়া!"

– "সেটা কোথায়?"

– "অনেক দূর। হুই ব্যারাকপুর লাইনে – টেরেনে করে যেতে হয়!"

– "আচ্ছা, তোর নাম তো বিদুর! তুই বিদুরের গল্প জানিস ?" সুপ্রীতি জিজ্ঞেস করল।

– "বিদুরের গল্প আছে বুঝি?" ছেলেটার চোখে মুখে একরাশ কৌতুহল।

– "আছে বৈ কি, অনেক আছে !"

– "কিন্তু, আমাকে তো কেউ বলেনি। ঠাকমা আমাকে শুধু ভুত, পেত্নী আর শিব-দুগ্গার গল্প বলত!"

– "বাড়িতে তোর ঠাকুমা আছে?"

– "এখন আর নেই। বুড়ো হয়ে গেছিল তো, আর বছরে মরে গেছে!"

– বিদুরের মাথায় হাত বুলিয়ে একটু আদর করে সুপ্রীতি বলল – "ঠিক আছে, আমাকে তুই ঠাকুমা বলিস, কেমন !"

বিদুর রুমার দিকে তাকিয়ে বলল – "আর তোমাকে ? তোমাকে কি বলব ?"

– "আমাকে তুই দিদিমা বলিস।" ওরা তিনজনেই হেসে উঠলো। এরপর সুপ্রীতি বিদুরকে পাশে ডেকে নিয়ে একটা গল্প বলতে শুরু করল! ছেলেটা ওর মুখের দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে মন দিয়ে গল্প শুনছিল !

পাশ দিয়ে যেতে যেতে পুজোর সেক্রেটারী অনিল মিত্র বলল – "বাহ, ঢাকীর ছেলেটার সাথে আপনারা দেখছি দিব্যি ভাব জমিয়ে নিয়েছেন!"

রাতের বেলা সুপ্রীতি যখন প্যান্ডেলে ঢুকল, ততক্ষণে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শুরু হয়ে গেছে। ওকে দেখে বিদুর দৌড়ে এসে বলল – "ঠাকমা, তোমার জন্য চেয়ার রেখে দিয়েছি, বোসো এখানে। দিদিমা তো কখন এসে গেছে! সামনে বসেছে।"

হাসিমুখে সুপ্রীতি বলল – "ঠিক আছে। আমি এখানেই বসি।" একটা চেয়ার নিয়ে এসে বিদুর একটু তফাত রেখে সুপ্রীতির পাশে বসল। অনুষ্ঠানে তার বিশেষ মন নেই। মাঝে মাঝেই সে সুপ্রীতির দিকে তাকাচ্ছে। একটু পরে বলল – "ঠাকমা, কাল আর একটা গল্প বলবে তো?"

– "আচ্ছা, কাল ভোগ নিবেদনের পর আসিস। কাল তোকে বিদুরের গল্প বলব। তোর গল্প শুনতে ভালো লেগেছে?"

– "খুব ভালো লেগেছে!" ঘাড় কাত করে বিদুর বলল। "তুমি খুব ভালো গল্প বলতে পার।"

বিদুরের কথায় সুপ্রীতি হাসল। হাসিটা একটু ম্লান। ওর শরীরটা ঠিক ভালো লাগছিল না। অনুষ্ঠান শেষ হবার আগেই সে উঠে ঘরে চলে গেল!

পরদিন রুমা আর ইন্দিরার সাথে পুজো প্যান্ডেলে ঢুকে সুপ্রীতি দেখল ভোগের আরতি চলছে ! ঢাকের তালে তালে বিদুর তখন কাঁসর বাজাচ্ছিল। কিন্তু তার মধ্যেও সে রুমা আর সুপ্রীতিকে দেখতে পেয়ে এক গাল হাসল। আরতি শেষ হতে বিদুর কাঁসর রেখে দৌড়ে ওদের কাছে এসে জিজ্ঞেস করল – "আইসক্রিম এনে দেবো ?"

মাথা নেড়ে সুপ্রীতি বলল – "না,আজ আর আইসক্রিম নয় ! আমাদের তিনজনের জন্য চা আনতে হবে। কিন্তু তুই নিজের জন্য আইসক্রিম নিবি!"

বিদুর সঙ্গে সঙ্গে ছোটাছুটি করে চা, আইসক্রিম সব নিয়ে এল। তিন বন্ধু চা খেতে খেতে গল্প করছিল। বিদুর ওদের পাশে দাঁড়িয়ে আইসক্রিম শেষ করল। তারপর একটু উশখুশ করে সুপ্রীতির শাড়ির একটা কোনায় টান দিয়ে বলল – "বিদুরের গল্পটা বলবে না ?" এরপর সুপ্রীতির পাশের চেয়ারে বসে মন দিয়ে মহাভারতের বিদুরের গল্প শুনছিল একালের ছোট্ট বিদুর!

গল্প তখন মাঝপথে, ভোগ খাবার ডাক পড়ল! রুমা আর ইন্দিরা বলল – "এখন ভোগ খেতে চল সুপ্রীতি। এমনিতেই অনেক বেলা হয়ে গেছে ! বাকি গল্পটা তুই সন্ধ্যা বেলায় শুনে নিস, বিদুর!"

দশমীর দিন সকাল থেকেই বিসর্জনের তোড়জোড় চলছে। পুজো, দধিকর্মা, সব হয়ে গেল। বিদুর ভিতরে ভিতরে বেশ অস্থির হয়ে উঠছিল। ঠাকমা তো এখনও এলো না! কাল রাতেও আসেনি। বিদুর পুরো প্যান্ডেল ঘুরে খুঁজেছে। ঠাকমা, দিদিমা কাউকেই দেখতে পায়নি! ঠাকমা গল্পের শেষটুকু কাল রাতে বলবে বলেছিল। এলোনা কেন, কে জানে ? অন্য কোথাও ঠাকুর দেখতে গেছিল বোধহয়! কিন্তু সকালেও তো আসছে না। একটু পরে তো বিদুর ওর বাবার সাথে ন'পাড়ায় চলে যাবে। এখন না এলে ঠাকমার সাথে তো আর দেখাই হবে না!

একবার অনিলবাবুকে দেখতে পেয়ে বিদুর তার কাছে ছুটে গেল,কাকু, কাল যে ঠাকমার পাশে আমি বসেছিলাম , সে আসছে না কেন, জানো? কোথায় আছে সে?

তাড়াহুড়োর মধ্যে ছিল অনিল! অবাক হয়ে বিদুরের দিকে তাকিয়ে বলল – "তোর ঠাকুমাকে আমি চিনব কি করে ? ভাল করে খুঁজে দ্যাখ, এখানেই কোথাও আছে!"

ওদিকে আবাসনের একটা ঘরে সুপ্রীতি তখন জ্বরের ঘোরে অর্ধচেতন অবস্থায় আছে! ঘরের মধ্যে একজন নার্স ছাড়াও আরো জনা তিনেক লোক। তার মধ্যে রুমা একজন। পুজোর দিনে ডাক্তার পাওয়া খুব মুস্কিল। তবু ওরা চেষ্টা করছে,যদি কাউকে পাওয়া যায়!

জ্বরের ঘোরেও লাল লাল চোখ মেলে সুপ্রীতি চারদিকে তাকিয়ে কিছু একটা খুঁজতে খুঁজতে দুবার বলে উঠল – "বাবু! বাবু!" রুমাকে নার্স জিজ্ঞাসা করলো – "বাবু কে? আপনি জানেন?"

– "হ্যাঁ, ওনার ছেলে। আমেরিকায় থাকে!"

এমন সময় ঘরে একজনের মোবাইল বাজল। মোবাইলে কথা বলে সে জানালো, ডাক্তার আসছেন। তবে এখনও ঘন্টাখানেক লাগবে এখানে পৌঁছাতে!

বেদি থেকে প্রতিমা নামানো হয়ে গেছে! একটু পরে বিসর্জনের জন্য ট্রাকে তোলা হবে। ঢাকী ঘুরে ঘুরে ঢাক বাজিয়ে বখশিশ সংগ্রহ করছে। ছেলেকে এদিক ওদিক করতে দেখে ধমক দিল – "কী করছিস, বল তো ? শুধু এদিকে ওদিকে ছটফট করে দৌড়ে বেড়াচ্ছিস ? শান্ত হয়ে আমার পাশে দাঁড়িয়ে থাক!"

দূর থেকে ইন্দিরা কে আসতে দেখে বিদুর দৌড়ে গেল। ইন্দিরাকে জিজ্ঞাসা করল – "ঠাকমা এলো না?"

ইন্দিরা বিদুরের মাথায় হাত দিয়ে আদর করে বলল – "তোর ঠাকমার খুব জ্বর হয়েছে। উঠতেই পারছে না মোটে!"

বিদুরের মুখটা একেবারে শুকিয়ে গেল। সে মাথা নীচু করে সেখান থেকে সরে গেল । প্রতিমার সামনে তখন খুব ভীড়! এক কোনে হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে বিদুর দুর্গা ঠাকুরের দিকে ছলছল চোখে তাকিয়ে বলল – "আমার প্যান্ডেলের ঠাকমাকে তুমি ভালো করে দিও, ঠাকুর! সামনের বছর এসে যেন আবার ওই ঠাকমাকে দেখতে পাই !"

# নবনীতা বসু হক

## আধুনিক

ভূমি আর তার ঠাম্মার মায়ের খুব বাদানুবাদ চলছে!

ঠাম্মার মা বম্মা বলেছে,

অইসব কী ড্রেস! সামনেডা সবডা দেখা যায়! তুমি বড় হইসস, ড্রেস বুইঝা পরবা না ক্যান?

ঠাম্মা ভূমির দলে। বলে,

এইসব আজকের দিনের ফ্যাশান মা।

তুমি আর লাই দিও না নাতনিরে। এই বয়সে আমাগো বিয়া হইয়া যাইত। শাড়ি পইরা মাথায় ঘোমডা টাইনতে হইত!

সেসব আগেকার দিনের কথা।

কেন তুমিও তো শাড়ি পইরা থাকতে পথ্থম পথ্থম । তারপর চাকরি পাইলে আর বললে কী, ছালোয়ার পরবে!

তোমার বউমা আবার বলল, জিনস ছাড়া চাকরি করন যায় না। কালে কালে কত কী যে হইল – হনুমানের ল্যাজ গজালো !

ভূমির মা সুতপা বলল,

দিম্মা সালোয়ার বল। ছালোয়ার নয়।

অর্ধেক তো ইঞ্জিরি বলিস, বাংলা কী বোঝস! মেয়েডারে তো বুক খোলা জামা পরাইতছস।

সদ্য এসেছে বম্মা। থাকে রাণাঘাটে। বাঙাল ভাষা ছাড়বে না কিছুতেই। ভূমির পোশাক নিয়ে এসে থেকেই খিটখিট করছে। ভূমির মা সুতপাকে তা নিয়ে বলছে!

সেই বম্মা জানলার ধারে কাল ডেকে বলল,

ভূমি। কাগজ পড়ছস!

কী পড়ব বম্মা ?

মেয়েদের বিয়া এখন থিইক্যা আঠেরো না, একুশ বৎসর হইব। আমাগো যুগ হইলা আমার পডাটা হইত। তখন তো . . .।

রণ, ভূমির বাবা পাশেই। বলল,

কিন্তু কত গরীব মেয়ের সর্বনাশ হল বল তো দিদা! আঠেরোতে বিয়ে না দিলে কত মেয়েই সমস্যাতে পরবে!

থাম রণ। একেব্বারে সেকেলে হয়েই থাগলা ।

বলেই বলল,

ভূমি কিছুই বুঝতে পারতাছি না। কেন একুশ আগে করলা কী দোষ ছিল ক ত!

তুমি ড্রেস দেখলে রেগে যাও। আর এখন বিয়ের বয়স একুশ হওয়াতেই খুশি ।অদ্ভুত মানুষ বাবা তুমি!!

ভূমির মা সুতপা বলল,

তোমাদের কালে অল্প বয়সে বিয়েটাই ছিল নিয়ম। পড়াশোনাটা ছিল ঘরেই। আর এখন মেয়েদের বাইরে বেরোনোর রাস্তা খুলছে। আর বিয়ের বয়স তাই বাড়ছে। তবে গরীবের চিন্তা বাড়ল বটে!

বম্মা বলল,

মাইয়াদের সাত তাড়াতাড়ি বিয়া দিতাছে! দেশে কী আইন নাই? অগো বোঝাইতে হইব।

আইন মানলে গরীবের চলে না দিদা। বুঝিয়ে কি হবে! তাড়াতাড়ি বিয়ে হলে গরীব নিশ্চিন্ত হয়।

হ।

ক'দিন পর  বম্মা চলে গেল রানাঘাট। রণর দাদু একা আছে। ঠাম্মা তাই দিতে গেল।

সুতপা সেদিন  বলল,

এই ভূমি! এই দেখ! বম্মার ছবি বের হয়েছে কাগজে ! তোর ঠাম্মাও আছে পাশে!

কে?

তোর বম্মারে!

শুনে বাবা বলল,

রানাঘাট গিয়েই মা মেতে গেল! এদিকে ক'দিন যে হাতের রান্না খাইনি মার।

সুতপার মুখ অমনি গোঁজ। তার রান্না ভাল লাগে না রণ'র। সুতপা ঘটি তো ! তার হাতের রান্নার স্বাদ নাকি ভাল না। সেদিন পাটিসাপটা ভাল করে খেলই না রণ। মার মত নাকি হয়নি ! ভূমি তো নেড়েচেড়েই রেখে দিল।

রণ রাতে ভূমিকে  বলল,

বম্মা কী করেছে দেখ! মেয়েদের  জড়ো করে সভা করছে! কেন বলত! আঠারো বছর একুশ হয়েছে বলছে সভার সবাইকে!

ফালতু এসব কথা শুনে আমি কী করব!

সুতপা বলল,

তোর বম্মা যে মেয়েদের নিয়ে সভা করেছে তারা সালোয়ার, জিন্স পরেছে রে ভূমি!

আমার কোন আগ্রহ নেই বম্মার ব্যাপারে ।আমাকে যা তা বলছিল এসে! অথচ আমিই বিছানা শেয়ার করেছি ।

ছিঃ ।ভূমি ।

কাগজটা দেখছে ভূমি রাতে একা নিজের ঘরে । পোশাকে ট্রেন্ড না করেও এই বম্মা কাগজে খবর হয়ে গেল !আর সে একটা ফ্যাশন ডিজাইনার হবে ভেবে কিছুই করে উঠতে পারছে না!

পরদিন রণ বলল,

মাকে আনতে যাব কাল ।

সুতপা বলল,

আমিও যাব ।

ভূমি বলল,

আমি কিন্তু নেই । সকালে ঘুম থেকে না উঠিয়ে চাবি দিয়ে বাইরে থেকে চলে যাবে!

সকালে বাবা ভূমিকে ডাকল । বলল,

চল ।খেঁজুর রস খাব কাল ।

ভূমির কী মনে হল! চলল ।

শাড়ি পরেছে ভূমি । শাড়ি পরে বম্মাকে দেখিয়ে দেবে, কতখানি খোলামেলা হওয়া যায় শাড়িতেও । তাছাড়া যদি ঠাম্মা তার বাপের বাড়ি থেকে যায়! ঠাম্মা কে সে খুউব মিস করছে!

বম্মা সভাতে । ঠাম্মা কে ফোন করে সেখবর জানল বাবা । শাড়িতে পিন করেছে সরু করে ভূমি । স্কার্টের ওপর পরেছে শাড়িটা ।

বম্মা মঞ্চ থেকে নেমে এল ওদের দেখে । খুব খুশি । কিন্ত পরের মুহূর্তে নাক সিঁটকে ভূমির দিকে তাকিয়ে ফিসফিস করে বলল,

এ কীরকম শাড়ি পড়ছস! সব খোলা!

ঠাম্মার বুকে ভূমি ততক্ষণ ।

ঠাম্মা বলল,

তোমার সভার মেয়েরা তো জিন্স পরেছে । ও তো বরং অতিরিক্ত কাপড়ে ঢাকা দিয়েছে!

বাবা আর মা পেছনে আসছে ।ব ম্মা বকছে তার নিজস্ব ভাষাতে,

একুশ কী কস রণ, আঠেরোর আগে বিয়া দেওনের জন্য ছটরফটর করতাছে অনেক মুর্খগুলা । বোঝাইতাছি, অন্তত বিয়ার যুগ্যি হোগ তাগো মাইয়ারা! কেডা শোনতাছে! অ মাইয়া . . . অ মাইয়া . . . ভূমি মাইয়া . . . রাগ করসো! তোগো মা বেটির লগে জিনিস আর কার্ট কিইনা রাখসি । গিয়া পরস ।

## উদ্দালক ভরদ্বাজ

# ফিরিয়ে তুমি

আজ তোমায় কাছে পেতে ইচ্ছে করল
হারিয়ে-যাওয়া বন্ধু !
আজ তোমার পাশে বসে, তোমার হাত ধরতে ইচ্ছে হল
হারিয়ে-পাওয়া বন্ধু !

আজ তোমার ছবিতে তোমার হাসি,
তোমার কবিতার নিচে তোমার মায়াবী শব্দের
ওড়নার জালে আটকে-যাওয়া অনুরাগীর
ছন্দোবদ্ধ এবং দুর্বোধ্য মতামত
দেখে
পুরনো অনুরাগ
ফিরে এলো মনে

মনে মনে ঘুরে এলাম
আমাদের হারানো বন্ধুতার
অলীক বারান্দায় –
যাকে তুমি মন-কেমন বলো,
বলতে ...

বুঝলাম, তুমি হারাও নি
হারাই নি আমি তোমায়,
হারাব না কোনদিন ...
কারণ,
আমার মনের মাঝে যে তুমি
সে আমায় খুব ভালবাসে
তখনো,
এখনো ...

সুদীপ্তা চট্টোপাধ্যায়

## দহনের ছাই ...

সময়ের গায়ে স্তব্ধতার অলংকার
অদ্ভুত অবসাদের দোপাট্টায়
মুখ এবং দৃশ্যপট

অথচ আজও অস্ফুট ফোটে ভোর
প্রাতঃকালীন রাগে, সূর্য জাগে

এক নতুন কিরণ লেখে
তার আলোর লেখনী
আমি নতজানু মাখি প্রাণ

কিছু পথ হাঁটে, অপরূপ প্রাতে
আমি তুলে রাখি তার পদধ্বনি

কিছু নাম ওড়ে ডানার অহংকারে
আমি সযত্নে এঁকে রাখি দূরত্ব
আমার পোড়া পালক থেকে
খসে পরে তীব্র আত্মহননের ছাই ...

সঞ্জয় চক্রবর্তী

## আখরবাসা

বাসতে বাসতে ভালোর কাঁটা কেমন করে সই ?
গচ্ছিত মন তোমার কাছে শতকরা একশোই,

আসল জমা, সুদ বেড়েছে, ঘুম উড়েছে শেষে,
আঁক কেটেছি জীবনখাতায়, দু এক লাইন এসে

থমকে দাঁড়ায়, হাতড়ে বেড়াই, চোখেতে কালশিটে,
ভাবলে তোমায় হিসেব গোলায় মনের ব্যালেন্সশীটে।

ঠুনকো ভীষণ, খেলনামাটির মন ভেঙ্গেছে যতো,
সময় তত মারছে চাকু শার্দুলকের মতো।

বসন্তসেনা ভাবনা জুড়ে শব্দ আসে কমে,
ধার নিয়েছি শূদ্রককে, তার মৃচ্ছকটিকমে।

ফেরার হবো দুজনে ফের ? খুঁজুক নিন্দুকেরা,
তিলোত্তমায় যেমন হারায় নিখিলেশ আর নীরা।

তোমায় নিয়ে ইতস্তত শব্দ যত ছিল
কুড়িয়ে নিলাম, জমিয়ে যে আজ কবিতাই জন্মালো।

অক্ষরেতে তোমায় চাওয়া, নীরব চোখের ভাষা,
দেহাতি মনে নেহাতই বানাই টুকরো আখরবাসা।

সৌমিত্র চক্রবর্তী

## দীনেশ স্যার, আপনি বেঁচে আছেন ?

দীনেশ স্যার, আজ আপনাকে হঠাৎ মনে পড়ল।
আমি মধু দিয়ে রুটি খাই –
ট্রান্সলেশন দিয়েছিলেন আপনি,
পারিনি।
আমি অনেক কিছুই পারিনি দীনেশ স্যার।
বাবাকে বলে উঠতে পারিনি
তাকে কতো ভালোবাসি,
জীবনে একটা প্রেমও
সার্থক ভাবে করে উঠতে পারিনি।
এখন থেকে অন্যায়ের সঙ্গে
আর সমঝোতা নয় – পারিনি কিছুতেই।
আমি মাসাইমারা যেতে পারিনি,
জোছনা কুড়োতে পারিনি,
বলব ভেবেও বলে ফেলতে পারিনি
আমি স্বাধীন।

দীনেশ স্যার, আমাদের সবার জীবনে
এরকম না-পারা থেকে যায়।
দীনেশ স্যার, পারব জেনেও
আমরা সব্বাই পারিনা অনেক কিছু।
অনেক ট্রান্সলেশন আজ আমি পারি স্যার।
আদর্শ থেকে সমঝোতা,
সততা থেকে কারচুপি,
প্রতিবাদ থেকে চোখ বুজে থাকা
ট্রান্সলেশনে আর একটুও সময় লাগেনা আমার।

আমি ঘুষের টাকা দিয়ে তাজ বেঙ্গলে খাই,
উপরিতে গলদা চিংড়ি খেয়ে ফেলি,
শুধু মধু দিয়ে রুটি খেতে পারিনা আজও।
ট্রান্সলেশনে আটকে যায়।
কৃত্রিমতা থেকে সারল্যে ট্রান্সলেশন,
ধ্বস্ত প্রৌঢ়ত্ব থেকে শৈশবে ট্রান্সলেশন,
বহু জরুরী ট্রান্সলেশন আজও বাকি রয়ে গেল।
দীনেশ স্যার, আপনি বেঁচে আছেন?
আমি ট্রান্সলেশন শিখব।
আমি শৈশবের মধু দিয়ে রুটি খাবো।

# মানস ঘোষ

## পাসওয়ার্ডের নাম

বাড়ি ফিরে দেখলাম,
চিঠির ঝাঁপি খুলে বসেছো।

তোমার চিঠি, আমার চিঠি, সঙ্গে
তেইশ বছর পুরোনো ডাইরি,
আমার ব্যক্তিগত দিনলিপি।

যেন মিলিয়ে দেখছ,
আবেগের আলো ছায়া
ও তার কার্যকারণ সম্পর্ক।

নিজের চিঠির ছেলেমানুষীতে
হেসে আকুল, কখনো আমার লেখায়
নতুন করে প্রেমে পড়া।

আমি যে ঘরে ফিরেছি,
তোমার সামনেই দাঁড়িয়ে,
কিছুই টের পাচ্ছনা যেন ...
তুমি তখন ডাইরির পাতায়
পলাশ প্রচ্ছদ
আর জ্যোৎস্না জাফরির কাব্যে মশগুল,
পূর্ববর্তিনীর ছায়া কল্পনায়
ম্রিয়মান তুমি, চোখ ভেসে যায় জলে

মনে পড়ে না কিছুতেই
মনে করতে পারিনা,
এমন কাব্যের উৎসমুখ
কী ছিল তখন
আমারও মন খারাপ হয়

পড়ে দেখতে থাকি,
তোমার চিঠি, আমার চিঠি, দিনলিপি

ব্যক্তিগত কিছু নেই আর,
আমাদের একটাই সিন্দুক
গোপনীয়তার একটাই চাবিকাঠি ...
পাসওয়ার্ডের নাম বন্ধন।

বালার্ক ব্যানার্জী

## ২০২৩ দেশে ফেরা

Pandemic এর পর দেশে ফিরে
কই? কেমন লাগছে ? বললে না?
মোড়ে মোড়ে নতুন ক্যাফে খুলেছে
উপচে পড়ছে বই মেলা।
বিয়ে বাড়ি আবার জমে উঠেছে
মাস্ক ছাড়া মজাই আলাদা
পার্ক স্ট্রীটএ আবার ট্রাফিক জ্যাম
ডোভার  লেনে জলসা।
অ্যাকাডেমি তে আবার নাট্যোৎসব
নন্দন চত্বর জমজমাট
ভাঙ্গা ব্রিজ আবার জুড়ে গেছে
ঝলমলে মাঝেরহাট।
বাস, মেট্রো ভিড়ে ভিড়াক্কার
চার দিকে মানুষের গাদাগাদি
কিন্তু সেই ভিড়ের মধ্যেও
এক একটা সিট কিন্তু  খালি।
অ্যাকাডেমি হাউস ফুল হলেও
অনেকের টিকিট আর কাটা হয় না।
বই মেলায় তাদের প্রিয় উপন্যাস
এই বছর থাকবে তাকে রাখা।
চলে গেলো তারা।
হিসেব তো কিছুই মিলল না।
শহীদ হল, কি বলি
তাও ঠিক জানি না
ময়দানে ঘুরে খুঁজে পেলাম না
কোনো মনুমেন্ট তাদের স্মৃতিতে
তাদের জন্য কোনো দিবস হল না
কোনো সরণি তাদের নামে।
কোনো মঞ্চে আর পালন করা হয় না
দু মিনিট নীরবতা
দেহের প্রাচুর্য্য বলেই হয়তো
প্রাণের দাম এত সস্তা।
Pandemic তো মিটে গেছে
এবার ভুলে যাওয়ারই পালা
শুধু এবার দেশে ফিরে
অনেকের সাথে আর দেখা হলো না।

সুপর্ণা চ্যাটার্জী

## এক সাধারণ সত্যের খোঁজে

নিছক এক সাধারণ মেয়ে সে, নেহাতি নামের প্রয়োজনে ভেবে নাও সুনীল বাবুর নীরা, বা ওঁনার মঞ্জরী হয়তো ।

উন্মুক্ত আকাশের থেকেই ধারে নেওয়া একখানা নীলাম্বরী চাদর গায়ে শুয়ে আছে সাধারণ মেয়ে, নীরা বা মঞ্জরী ।

ব্যস্ত শহরের ছটফটে অস্তিত্বে কেবলই একাকিত্বের বেঁচে থাকা, তার নিস্তরঙ্গ জীবনের খোঁজেই এই গল্প ।

শুয়ে আছে চিৎ হয়ে, গায়ে পুরোনো আদরের পাতলা নীল চাদর, চোখ বোজা ।

মা তার খুব কাছেই আছে, চোখ বোজা তবু মালুম পাচ্ছে মেয়ে, আটপৌড়ে মায়েদের চেনা গন্ধ, হলুদ, পাঁচফোড়ন, এর সাথে মিলে মিশে ভেজা চুলের জবাকুসুম ।

যত্নে পরিপাটিতে কপালে জলপট্টি দিতে দিতে মা বলছে, "দেখো দেখি, হঠাৎ কি এক বেয়াক্কেলে জ্বর, দুপুরেও তো বেশ ভালোই ছিলো, কি যে হলো, বুঝতেই পারছি না, temperature তো সমানেই বেড়ে চলেছে" ।

ধরা যাক মেয়ের বয়েস কম,

"অল্প বয়েস তার ।
একজনের মন ছুঁয়েছিল সেও ।
সেই কাঁচা বয়সের মায়া
জেনে পুলক লাগত দেহে
সে ভুলে গেল যে সে এক
সাধারণ মেয়ে ।"

এক সাধারণ সত্যের খোঁজে আজ নীরার কাছে এসে দাঁড়াই আমি, ওর কপালে হালকা হাত দিলাম, কপালটা একেবারে জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে। নীরা চোখ মেলে তাকালো। তারপর অস্পষ্ট গলায় বলল, "আমার মন খারাপ লাগছে খুব" ।

বেশ খানিক ভুরু কুঁচকে ডাক্তারবাবু রায় দিলেন, "হয়ত viral infection, তবে blood test না করা অব্দি বোঝা মুশকিল" ।

সে দিন থেকেই শহর জুড়ে শুরু হলো বিষম কান্ড, পথ অবরোধ, মিটিং, মিছিল, ধর্মঘট । ফের এক দল স্বপ্ন দেখার সাহস নিয়ে সমাজের প্রতিনিধি মানুষ, যাদের মান আর হুঁশ অটুট, যাদের শিরদাঁড়া নুয়ে পড়েনি, আত্মা বিকোয়নি আজও, জমির অটুট, সঙ্গবদ্ধ হলো তারা, এক বিরাট আন্দোলনে নামলে শুধু সাহসের ভরসায়, "after all tomorrow is another day" ।

পথে নেমেছে মানুষের ঢল, মিছিলে স্লোগান, বিপ্লবের গান, অনেক না পাওয়া অভিমানে বেড়ে ওঠা দাবি । তাদের সাথে ঘটল রাষ্ট্রের বিরোধ, খানিক হাতাহাতি, মারামারি, শহরে জিনিস পুড়লো অনেক । আগুনের আহুতিতে ছিলো

রাজনীতি আর সমাজনীতির প্রতিশ্রুতি, অজস্র অজুহাত, বাষ্পে ভেজা নালিশ, না দেখা কান্না, না পাওয়ার কথা, অনেক সত্য।

আমি অস্থির পায়ে অপেক্ষা করি, কামনা করি নীরা সুস্থ হোক। প্রার্থনা করি সেই শক্তির কাছে, নীরা তুমি ভালো হয়ে ওঠো। তোমায় ভালো হয়ে উঠতেই হবে, তুমি কি একবারও এই কলরবে মুখর মানুষের কথা ভাববে না? এই শহর শুধু তোমাকে চায়। তুমি না থাকলে কেমন করে নিতান্ত এক সাধারণ মেয়ের গল্প লিখবেন রবি ঠাকুর ? নীরা, তুমি ফরাসী বা জার্মান নাই বা জানলে, কিন্তু তুমি দুর্ভাগিনী মোটেও নয়। আজ, বিছানায় শুয়ে শুধু মন খারাপ করতে জানো, কিন্তু তোমার আজকের এই ভালো না লাগার সত্যটুকু ছড়িয়ে পড়েছে শহরের অলিতে গলিতে। নাই বা হলে বিদুষী, গণিতে প্রথম হয়নি তাও জানি, তবু নরেশ নিজে এসেছে আজ তোমার কাছে। এবার ভালো হয়ে ওঠো।

স্বপ্ন নিয়ে আজ মানুষ আবার বাঁচতে চায়, তারা সবাই মন থেকে দুয়া করছে, তুমি ভালো হবেই, হতেই হবে! নরেশ প্রায়শ্চিত্ত করবে কেমন করে?

হয়তো শহরে কারফিউ জারি হবে জানো, কিংবা হতে পারে, এই নিয়ে অনেক জল্পনা কল্পনা চলছে, কেউ কেউ বলছে, সমাজে ঘুণ ধরেছে তাসের দেশের মতো নিমেষে শেষ হবে সব।

Virus যখন, চিন্তার আর কিছু নেই, ডাক্তার বাবু এমনটাই তো বললেন, মোটা দুই ভুরু খানিক কুঁচকে।

তোমার কি জ্ঞান ফিরলো নীরা ? এখন কেমন আছো ?

তুমি অল্প হেসে উত্তর দেবে, "আমার মন ভালো হয়ে গেছে"।

বাইরে এখন চমৎকার ফুরফুরে হাওয়া দিচ্ছে, রাস্তায় গন্ডগোল থেমে গেছে, লোকের চেয়ে শাসনের দন্ড হাতে পুলিসের সংখ্যা ঢের বেশী। সবটাই যেন আবার স্বাভাবিক।

না স্রষ্টা তাঁর কল্পনা একটুও খাটো করেনি নীরা, বা রে তুমি তো জানো তিনি কৃপণ নন তোমার ঈশ্বরের মতো। যারা জ্ঞানী, যাঁরা বিদ্যান, যাঁরা বীর, যাঁরা কবি, যাঁরা শিল্পী, যাঁরা রাজা, তাঁরা সবাই ফের এসেছে দল বেঁধে। তাদের বোধ আর তাদের বুদ্ধি বন্দক না রেখে তাঁরা এসেছেন, শুভ অশুভর তফাৎ এখনো নির্ভয়ে করেন তাঁরা।

হ্যাঁ হ্যাঁ, আর তাঁরাই আজ তোমায় আবিষ্কার করেছেন, যেন এক নতুন জ্যোতিষ্ক তুমি, না না বিদুষী বলে নয়, নারী বলে। নরেশ মূর্খ তাকে ক্ষমা করে দিও নীরা।

দেবীপ্রিয়া রায়

# ধর্ম নিয়ে

বন্ধু বললেন, "লেখো"। শুধোলাম "কি নিয়ে লিখব বলে দাও"। "আরে এটাও কি বলে দিতে হবে ? শুনি তো সারা জীবন তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব নিয়ে পড়াশুনা করেছো। সেটা নিয়ে লেখার তো এই সময় – ধর্ম তো আজকাল হট টপিক। যে যা ধর্ম সম্বন্ধে বলছে, সেটা বাজারে কাটছে। এই মওকায় নাম কামিয়ে নাও, নাহলে তোমার কথা কেই বা শুনছে ? অপ্রস্তুত হয়ে বললাম, তা বটে ! তবে মুশকিল হল এই যে, আমি আবার গরুর বর্জ্য পদার্থের নানাবিধ উপকারিতা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানিনা। আমার এদেশীয় ছাত্র ছাত্রীরা যখন কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করত যে আচ্ছা তোমরা শুনি গরুকে দেবতাজ্ঞানে পুজো করো, তা তার মন্দিরটা কোথায় ? তখন ভারী মুশকিল পড়ে যেতাম। প্রাণপণে তাদের বোঝাতে চেষ্টা করতাম যে সেরকম কোন মন্দিরের সন্ধান জানা নেই, যেখানে গোমাতা হাম্বা বলে ডাক ছাড়ছেন আর ভক্তরা সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করছে। হ্যাঁ, শিবমন্দিরে গর্ভগৃহের মুখোমুখি নন্দীর মূর্তি থাকে, তবে তিনি তো গোমাতা নন্, তিনি হলেন শিবের বাহন ষাঁড় বাবাজী। অত্যন্ত প্রভু ভক্ত, প্রভু শিবঠাকুর যদি কোথাও তুরন্ত যেতে টেতে চান, সেই অপেক্ষায় তিনি তাঁর মন্দিরের সামনে নিজেকে পার্ক করে চুপটি করে দাঁড়িয়ে থাকেন। ফুল মালা দুধের ঘটি নিয়ে প্রভুকে দর্শন করতে যাঁরা আসেন, যাওয়া আসার পথে তাঁদের অনেকেই অধিকন্তু ন দোষায়, এই ভেবে বাহনটির গলায়ও একটি গাঁদার মালা পরিয়ে খানিক সিঁদুর লেপে যান। কিন্তু তিনি তো পুংলিঙ্গ, মানে ঠিক মাতৃস্থানীয় নন্, তাঁকে মালা পরানো – সে তো গো মাতার পুজো হলোনা। এসব ব্যপারে গোলমাল করলে নন্দী ঠাকুর না বিরক্ত হন। আমার আবার শিবঠাকুরের হেড আপিস কাশীধামে জন্ম কর্ম বলে নন্দীঠাকুর বিরক্ত হলে কি হয়, তার কিছু কিছু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাও রয়েছে। পাগলা ষাঁড়ের তান্ডব দেখেছি অনেকবার। এমনকি চুপি চুপি বলে রাখি একবার নিতান্ত অকারণে একজন ষাঁড়ের শিংয়ের গুঁতোও খেয়ে ভুগেওছি কিছুদিন। কাজেই তাঁদেরকে গোমাতার সাথে গুলিয়ে ফেলে তাঁদের রাগিয়ে দেওয়াটা মোটেই বুদ্ধির কাজ হবে না। পুরুষতান্ত্রিক দেশে বাবা মা মানে গো বংশের বাবা মা গুলিয়ে ফেললে বিপদ প্রচুর। অতএব ও টপিক বাদ।

নেক্সট হট টপিক অবশ্যই রামচন্দ্র । প্রথমে মনে হল এটা সেফ। ছোটবেলা থেকে অন্ধকারে ভয় পেলেই "ভূত আমার পুত শাঁকচুন্নি ঝি, রাম লক্ষণ বুকে আছেন, করবি আমার কি ?" বলে জোরে জোরে চেঁচিয়েছি। তাছাড়া রামধুন গান তো আমাদের সেকালে ভক্তিভরে সর্বত্র গাওয়া হত; কোন অনুষ্ঠান বাদ যেত না। আমরা তখন সদ্য সদ্য স্বাধীনতা পেয়েছি, সক্কলে গান্ধীজীর আদর্শে মশগুল। তাঁর প্রিয় গান রামধুন তাই সবার মুখে মুখে। তাছাড়া রামের গল্প টল্প তো সব জানা। রামায়ণ পড়েছি সেই অক্ষর পরিচয়ের সময় হতেই – প্রথমে উপেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরীর লেখা, তার পর কৃত্তিবাস ওঝার লেখা। যেখানে থাকতাম, বাড়ীর পাশেই ছিল সঙ্কটমোচনের মন্দির। জনশ্রুতি তুলসীদাস ঐখানে রামচরিতমানস লিখে হনুমানজীকে শোনাতেন। আমাদের বাড়ীর সকলেরই শনি, মঙ্গলবার সেখানে দর্শন না করলে চলত না। কাজে কাজেই হনুমান চালিসা আউড়াচ্ছি যখন কথা বলতে শিখেছি, প্রায় তখন থেকেই। আমার গলায় মা ঝুলিয়ে রেখেছিলেন ছোট্ট একটি রামের ছবি দেওয়া লকেট। ভয় ভাবনার সময়ে সে ছবি আমাকে নিশ্চিন্ত করে রাখত। রামচন্দ্রের কি চমৎকার শান্ত হাসি মুখ, কত প্রচন্ড বীর, তবু কি মিষ্টি শান্ত স্বভাব। সবাইকে বেশ সাহায্য করেন, কারুকে লজ্জা দেন না, বিব্রত করেন না। শবরীর এঁটো কুল তাকে একটুও বুঝতে না দিয়ে হেসে হেসে খেয়ে নিলেন, তারপর আবার নদী পার করে দেওয়া কৈবর্ত মাঝিটিকেও সখা বলে জড়িয়ে ধরলেন। এঁকে ডাকলে কক্ষনো কোন বিপদ কাছে ঘেঁষবে না, জানতাম। কেমন বেশ বন্ধুর মতন ঠাকুর। বিপদে আপদে মুঠিতে সেটিকে চেপে তাই ভরসা পেতাম। তাই রামের সাথে ভাব আমার আজন্ম। তাঁকে নিয়েই নাহয় লিখি। অমনি আজকের বয়স্ক মন সাবধান করে বলে উঠল,

"সর্বনাশ। আরে বিপদে পড়বে যে !" খুব বিদ্রোহী স্বরে নিজেকেই জবাব দিলাম, "কি যে বল, তার নেই ঠিক ঠিকানা ! বিপদে আপদে তিনি উদ্ধার করে এসেছেন চিরকাল, আর তাঁর কথা লিখলেই বিপদে পড়ব ? তুমিও যেমন – হ্যাঃ।" সাবধানী স্বরটি আবার হুঁশিয়ারি দিল – সে তোমার ঐ আদ্যিকালের রামচন্দ্র! আজকের রামচন্দ্র অমন ম্যাদামারা ঠাকুর নন। রাক্ষসে তাঁর বৌ তুলে নিয়ে গেল বলে জঙ্গলময় কেঁদে কেঁদে লতা পাতার কাছে খোঁজ করলেন। আজকে যাঁর পুজো হয়, দেখ গিয়ে তাঁর ছবি। রাগে টং হয়ে তীরধনুক হাতে লক্ষ্যভেদ করছেন – রাগের চোটে জটা টটা সব সোজা হয়ে রয়েছে। চারদিক হতে হলদে, কমলা আলোর ছটা বেরুচ্ছে। ওঁর সম্বন্ধে কোন তথ্য ভুল দিয়েছ কি গেছ, এই বলে দিলাম। তীর ছুঁড়ে একেবারে বালিবধ করে দেবেন। আর সব তথ্য কি ঠিক ঠিক জানা আছে তোমার? ঐ দেখো না – শুনতে পাই আদতে গল্পটা লিখেছিলেন বাল্মিকী মুনি, মানে যিনি গোড়ার দিকে দস্যু রত্নাকর ছিলেন। তারপর তো ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর তাঁকে ডাকাতি করার পাপের ফল একা একা ভোগ করতে হবে এইসব ভয় দেখিয়ে টেখিয়ে রামনাম শিখিয়ে পড়িয়ে কত বছর ধরে জপ করিয়ে মুনি বানালেন ... । শেষে ব্যাধের পাখি মারা দেখে দুঃখে কবিতা লিখে ফেলে তবে গিয়ে তিনি রামের জীবনী মানে রামায়ণ লিখলেন। কিন্তু এত কান্ড করেও রামের জীবনের সব কথা ঠিক ঠিক লিখেছেন কি? তাহলে দেশে বিদেশে কত রামায়ণ লেখা হল, কোনটা অন্যটার সাথে মেলে না কেন ? আমাদের বাংলাদেশে গল্প'টা বেশ পাঁচালীর সুরে লিখলেন কৃত্তিবাস ওঝা। অথচ সে গল্পের সাথে বাল্মিকী রামায়ণের নানান ফারাক। ওধারে হিন্দীভাষী মুলুকে গোস্বামী তুলসীদাস আওধীতে লিখে বসে আছেন রামচরিত মানস। তার সাথেও বাল্মিকী রামায়ণের নানান গরমিল। গোটা উত্তরকান্ডটাই সেখানে বাদ, মানে সে গল্পে রামসীতা লঙ্কা থেকে ফিরে এসে সাকেতে বছরখানেক নতুন করে হানিমুন সেরে মনের সুখে রাজত্ব করতে থাকলেন, এই অবধি লিখেই গোস্বামীজী "দি এন্ড" বলে কাহিনীর যবনিকা পতন করিয়ে দিয়েছেন। সম্প্রতি আবার শুনি তাঁর লেখা "ঢোল গাঁওয়ার শুদ্র অরু নারী, ইয়ে চারোঁ তাড়ন কে অধিকারী "নিয়ে বিরাট গোলযোগ বেঁধেছে। মানে ঢোল, মূর্খ, গ্রাম্য লোক, শুদ্রজাতির লোক আর নারী অর্থাৎ মেয়েলোক – তাদের ধরে অবাধ পেটানো উচিত। নারী হিসাবে আমার অবশ্য আমাদের ধরে পেটানোর ছাড়পত্রের কথা গুলি পছন্দ হয়নি কোনোকালেই। আর আজকাল যখন ঐ নিয়ে তর্কাতর্কি তুঙ্গে, তখন ও পথ না মাড়ানোই ভাল। আরো কত জন দেশে বিদেশে রামায়ণ লিখে বসে আছেন। তাদের কে ভুল, কে ঠিক কে জানে। কাজ নেই বাবা পাপ বাড়িয়ে। এমনিতেই রোজ প্রচুর খুচরো পাপ জমা হয়ে যাচ্ছে, তার মাশুল গুনতে গুনতে আগামী গোটা কয়জন্ম যে কাবার হবে, তাতে সন্দেহ নেই।

তা পাপের কথা যখন উঠল, তখন পাপের হাত হতে কি করে উদ্ধার পাওয়া যায়, সে কথাটাও ভাবা জরুরী। উপোস টুপোস ব্রতপার্বণ করলে শুনেছি পাপ ধুয়ে যায়। কিন্তু ঠিক কোন ধরণের পাপ কি কি ব্রত কি রকম করে করলে ধুয়ে ফেলা যায়, সেটা আবার ঠিক জানা নেই। ছোটর থেকে দেখে আসছি আশেপাশে বেশ কিছু লোক মনের আনন্দে মিথ্যা বলে, লোক ঠকায়, অন্যকে কষ্ট দেয়, কিন্তু তাদের উপোস তিরেসের ঠেলায় চারদিকে ধন্যি ধন্যি রব। মন্দিরে তাদের এমনি ভীড় জমে যে আমাদের মত ছুটকো লোকেরা সেখানে ঢোকে, কার সাধ্যি। দানধ্যান করে ঘন্টা বাজিয়ে পুজো করে তারা একেবারে চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। নিশ্চয় তাদের সব পাপ ধোয়া হয়ে যায়, কিন্তু শাস্তরে তো অন্য রকম বলে শুনি। নাকি তাদের ধোয়াধুয়ির কোন স্পেশাল ফরমুলা জানা আছে ? যাকগে, আমি এমনিতেও বেশী উপোস করতে পারিনা। বেশীক্ষণ না খেলেই মাথা ধরে চোখে সর্ষেফুল দেখে ঐ গানটা মনে পড়ে যায়, "নিঝুম নিশীথ রাতে, একা বসে দোতালাতে খালি খালি খিদে কেন পায়রে।" সে অবস্থায়কি আর ঠাকুর দেবতাকে ডাকাডাকি করে পাপ ধুয়ে ফেলা সম্ভব ? তাছাড়া ডাকব যে, ঠাকুরকে ডাকার ঠিকপদ্ধতিই বা কি? এই ধরুন, আমার ঠাকুমা ছিলেন পরম শুদ্ধাচারিণী – গঙ্গাজল টলে খুব বিশ্বাসী। ছোট্ট ঠাকুরঘরে সার সার ঠাকুর সিংহাসনে দাঁড়িয়ে থাকতেন। সেসব ঠাকুরকে নিত্য ভোগ দেওয়ার থেকে রাত্রে ঘুম পাড়ানো সব নিয়মে বাঁধা। শ্বশুরালয়ে এসে দেখি, আমার শ্বশ্রুমাতা সকলরকম অশুচি স্পর্শ হতে দূরে পরিষ্কার মত একটি জায়গার অভাবে রান্না ঘরের সবচেয়ে ওপরের তাকে ঠাকুর রেখেছেন। রোজ সকালে একটি টুলে উঠে পুজো সারেন। বলাই বাহুল্য যে ছোট্টখাট্ট মানুষটির পক্ষে দিনে একবারের

বেশী সে বিপজ্জনক কসরত সম্ভব হত না। তা বলে কি তাঁর পূজাপদ্ধতি কি ভক্তি আমার ঠাকুরমার থেকে কম শক্তিশালী ? খুব শক্ত প্রশ্ন এসব। জট না খুললে কি নিয়ে লিখি ?

দুর ছাতা। তার থেকে আসলে ধর্ম জিনিসটা কি, তাই ভাবি বসে। তা করতে গিয়ে দেখি সেখানেও প্রচুর প্যাঁচ। নানা জন নানা কথা বলে। কেউ বলে ফুলচন্দন ধূপে ঠাকুরকে পুজো কর, কেউ বলে যজ্ঞ করো, গুরু নাও, জপ কর, ধ্যান করো, কেউবা আবার বলে কীর্তন করো। ধর্ম পালন করতে হলে কি এর সবগুলিই করব, না কোন একটা করাই কর্তব্য, কিছুই বুঝিনা। হঠাৎ মনে পড়ল যে ছোটবেলায় একবার রামকৃষ্ণ মিশনে দাদু ঠাকুমার সাথে ত্রিপুরারী চক্রবর্তী মহাশয়ের বক্তৃতা শুনতে গিয়েছিলাম। সব কথা বুঝিনি, তাই ভাল মনে নেই। কিন্তু একটা কথা মনে গেঁথে আছে। তিনি মহাভারতের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছিলেন, ধর্ম তা যা ধারণ করে। কিন্তু কে ধারণ করে, কি ধারণ করে তা তো মনে পড়ছে না। এই সব ভাবতে ভাবতেই মনে হল, যে আরে আরে – মানুষই যখন ধর্ম নিয়ে মাথা ঘামায়, তাহলে ধারণ করাটা তো নিশ্চয় মানুষের কাজ। কিন্তু কি ধারণ করা হয় ? এর উত্তরটা সোজা মনে হল – মানুষই যখন ধারণ করে, তাহলে নিশ্চয় সে তাই ধারণ করে, যাতে তাকে মানুষ বলে চেনা যায়। তাহলে তো হয়েই গেল মানুষের পরিচয় পত্রই হল তার ধর্ম।

এখন মানুষকে কোন কোন গুণের দরুণ মানুষ বলে চেনা যায়, সেটা বের করে ফেলতে পারলেই হল। মুশকিলটা হল গুণ তো একটা ফাঁপা কল্পনা নয়। কোন জিনিসের বা বস্তুর কি গুণ আমরা তখনই ভাল বুঝি, যখন সে বস্তুটিকে চোখের সামনে স্পষ্ট দেখি। এখন মানুষ হল প্রাণী, কিন্তু মানুষের ঠিক কোন গুণ দেখলে তাকে অন্য প্রাণীদের থেকে আলাদা করে চিনতে পারব, তাই ভাবতে বসলাম। ভাবতে গিয়ে পাশ্চাত্য দর্শনে অ্যারিস্টোটলের কথা মনে পড়ল। অ্যারিস্টটল প্রাণ আছে এমন বস্তু জগৎকে ভেষজ, পাশবিক ও বিবেকবুদ্ধি সম্পন্ন – এই তিনভাগে ভাগ করেছিলেন। পয়লা নম্বর হল, ভেষজ মানে গাছপালা – তারা মাটি হতে রস বা খাদ্য টেনে নিয়ে বেঁচে থাকে, কিন্তু সে সব জোগাড় করার জন্য কোন উদ্যোগ নিতে পারেনা। ব্যথা পেলে সেখান থেকে পালাতে পারেনা, আবার আরামের সন্ধানেও হেঁটে চলে যেতে পারে না। পশু বা পাশবিক প্রাণী এর থেকে খানিক উঁচু থাকের। সে খাবারের খোঁজে ঘোরে ফেরে, ব্যথা পেলে সে সেখান থেকে চলে গিয়ে আরামের আশ্রয় খোঁজে। আবার যদি সে দেখে যে তার যেটা ভাল লাগছে, অন্য কেউ সে সবে ভাগ বসাচ্ছে বা তার থেকে বেশী পাচ্ছে, তাহলে নোখে দাঁতে ধরে কামড়ে সে তা কেড়ে নেয়। গাছপালা অবশ্য এত সব কিছুই পারে না। কিন্তু পশুর দৌড়ও ঐ পর্যন্তই। অন্যের থেকে কেড়ে নিলে বা তাকে মেরে ফেললে আখেরে তার কি পরিণতি হবে, অতশত সে বোঝে না, বোঝার ক্ষমতাও রাখেনা। মানুষ এর ওপরের ধাপে। সে যে কোন পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে, যুক্তি তর্কদিয়ে পরিণতির কথা চিন্তা করতে পারে, বুঝতে চেষ্টা করে যে কোনটা তার পক্ষে ভাল কোনটা মন্দ। অ্যারিস্টটলের ভাষায় সে হল দুই পা ওয়ালা বা দ্বিপদবিশিষ্ট একটি প্রাণী বিশেষ, যে প্রাণী বিচারবুদ্ধি বা বিবেকবুদ্ধি রাখে। প্রাণী হিসাবে গাছপালা, আর পশুর গুণ সবই অবশ্য তার মাঝে রয়েছে। সেও খাদ্য, পানীয় নিয়ে বেঁচে থাকে, গাছপালা পশুর মতনই বংশবিস্তার করে, যা তার ভাল লাগে, তা নিজের জন্য জড়ো করে, অন্যের কাছ হতে মেরে ধরে কামড়ে সে সব কেড়ে নেয় বা নিতে ইচ্ছা করে। তবু সে গাছপালা পশুর থেকে ভিন্ন। তার যুক্তিপূর্ণ বিচার বুদ্ধি তাকে দেখিয়ে দেয় যে সে যদি গায়ের জোরে অন্যের ক্ষতি করে নিজের কোলে ঝোল টানতে চায়, তাহলে একদিন এমনও হতে পারে যে তার নিজের জিনিস অন্যে কেড়ে নিলে সেই অবিচার অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার অধিকার তার থাকবে না। এই সার সত্যটি সে বুঝতে পারে যে তার নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখতেই তাকে তাকিয়ে দেখতে হবে যে জগৎজুড়ে আসলে একটাই অস্তিত্ব ছড়িয়ে আছে। সেই অস্তিত্বকে সম্পূর্ণ ভাবে উপভোগ করতেই তাকে নিজের ক্ষুদ্র, সীমিত অস্তিত্বের উপরে উঠতে হবে।

এইখানটিতে এসে মন বলল যে, বোধহয় এতক্ষণে আলোর ইশারা পেয়েছো। ব্রত উপবাস, নিয়ম নিষ্ঠা মন্দির মসজিদ গির্জা, সব ছাপিয়ে মনের মাঝে শোনো – জগৎ জুড়ে উদার সুরে আনন্দ গান বাজে। জিশুর কথা মনে আছে কি – ঐ যে বলে গিয়েছিলেন, "প্রতিবেশীকে নিজের মত ভালবাসো – Love thy neighbor as thyself". আমাদের

শাস্তরও বলছে, “বসুধৈব কুটুম্বকম”, অর্থাৎ সমগ্র পৃথিবীর অধিবাসী তোমার আত্মীয়। প্রথম শুনলে মনে হয়, ওসব কথা বলতে বেশ, কাজে করা কঠিন। জগৎশুদ্ধু লোককে আত্মীয় কি ভাবা যায় নাকি ! কিন্তু না ভাবলে তো সেই পশুর স্তরে পড়ে থাকতে হয়। ভাবা যে যায় তার পথ দেখানো হয়েছে উপনিষদের সেই শ্লোকটিতে, “ ঈশাবাস্যমিদং সর্বম্ ইযৎ কিঞ্চিৎ জগত্যাং জগৎ। তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধ কস্য সিদ্ধনম্।” এ বিশ্বচরাচর একটি মাত্র অস্তিত্ব – সেই ঈশ্বর। খণ্ড খণ্ড ভাবে তা অকিঞ্চিৎকর। সে ঈশ্বরের স্বাদ পেতে হলে সমগ্রের সন্ধান করো। ক্ষুদ্রঅংশের লোভ ত্যাগ করো। রবীন্দ্রনাথ এই সত্যটির গান গেয়েছেন, “আপন হতে বাহির হয়ে বাইরে দাঁড়া, বুকের মাঝে বিশ্বলোকের পাবি সাড়া”। সমগ্র জগতের প্রতি এই আত্মবোধ – এই হল মানবতা, যা মানুষের পরিচয়, মানুষের ধর্ম।

# ইন্দ্রাণী দত্ত

## হাউ টু টেল আ শাটারড স্টোরি

(১)

*পাঠ*

"নাম কী ? বামুন জিগ্যেস করে।

দুলালী মৃধা। অনিকেত বলে।

দুলালী ? বামুন ঠাকুর দেহটা নিরীক্ষণ করতে থাকে। আর একবার প্রশ্ন করে, দুলালী ?"

....

– মুখাগ্নি করবে কে ?

মন্টুকে দেখায় ওরা। ....

জল ছিটাও। বলো অপহতা সুরারক্ষাংসি বেদীসদঃ।

....

– গোত্র কী ?

পঞ্চানন বলল, কচ্ছপ।

– কচ্ছপ হয় না, কাশ্যপ।

– বলো-কাশ্যপ গোত্রং প্রেতং দুলালী দেব্যাঃ এতত্তে তিলতড়ুলোদকং তৃপ্যস্য।

এসব কাজ-কর্মের পর পাটকাঠিতে আগুন ধরানো হল।

বদু হঠাৎ একটু দূরে গিয়ে আকাশের দিকে তাকাল। দু হাত সামনের দিকে বাড়ানো। দোয়া চাওয়ার সময় যেমন করে। বামুনঠাকুর জ্বলন্ত পাটকাঠি মন্টুর হাতে দিয়ে বলল মুখে ছোঁয়াও।

ঠিক তক্ষুনি মন্টু ভীষণ জোরে "মা, মা-মাগো" বলে কেঁদে উঠল।

মন্টু বলতে লাগল, বাবা গো, কতবার বলেছিলে "মা" ডাক খোকা, আমাকে "মা" ডাক। .... এখন তোমায় মা ডাকছি, তুমি তো শুনতে পাচ্ছ না। ....

– পড়ো-ওঁ দেবা দেবাশ্চাগ্নি মুখাঃ সর্বে হুতাশনং গৃহীত্বা এনং দহন্তু –

.... মন্টু নিজস্ব দহনে কেঁদে যায়।

....

শুনল না দুলালী।"[১]

"One morning, while she read the newspaper aloud to him, the old imam, who clearly hadn't been listening, asked-affecting a casual air-Is it true that even Hindus among you are buried, not cremated?

Sensing trouble, she prevaricated. "True? Is what true? What is Truth?"

Unwilling to be deflected from his line of inquiry, the imam muttered a mechanical response. "Such Khuda hai. Khuda hi Sach hai" .... The sort of wisdom that was available on the backs of the painted trucks that roared down the highways. Then he narrowed his blindgreen eyes and asked in a slygreen whisper: "Tell me, you people, when you die, where do they bury you? Who bathes your bodies? Who says the prayers?"

....

Having wounded each other, thus, deeply, almost mortally, the two sat quietly side by side on someone's sunny grave, haemorrhaging. Eventually, it was Anjum who broke the silence.

"You tell me", she said. "You're the Imam Sahib, not me. Where do the old birds go to die?" [২]

**********

১। হলদে গোলাপ; স্বপ্নময় চক্রবর্তী; দে'জ পাবলিশিং; প্রথম প্রকাশঃ জানুয়ারি ২০১৫, মাঘ ১৪২১।

২। The ministry of utmost happiness; Arundhatee Roy; Hamish Hamilton-an imprint of Penguin Books; First Published 2017.

**********

(২)

*হলদে গোলাপ*

ব্লার্বে যেমন আছে, এক কথায়, মানুষের লিঙ্গ পরিচয়ের সমস্যার আখ্যান "হলদে গোলাপ"। গল্পের বুনোটে ইতিহাস, নৃ-বিজ্ঞান, সমাজতত্ত্ব, শারীর বিজ্ঞান, মনস্তত্ব, জেনেটিকস, মিথ, পুরাণকথা। প্রাসঙ্গিক তথ্য হিসেবে জানি লেখক তথ্য সংগ্রহ করেছেন ১৯৯৪-৯৫ থেকে, লেখা শুরু হয়েছে ২০১১য় সম্ভবতঃ।

উপন্যাসে অজস্র চরিত্র, আখ্যান, চলতি রসিকতা, ইতিহাস, নৃ-বিজ্ঞান, সমাজতত্ত্ব, শারীর বিজ্ঞান, মনস্তত্ব, জেনেটিকস, মিথ, পুরাণকথা, বিষাদ, কান্না, ভালোবাসা। মূল চরিত্র অনিকেত আকাশবাণীর স্বাস্থ্য ও বিজ্ঞান বিষয়ের প্রযোজক- নানা অদ্ভুত কবিতা, সমস্যা নিয়ে চিঠি আসে। যেমন প্রেমার্থ কবি নামে একজন বর্ধমানের ভাতার থেকে লেখেন, *"তুমি নারী নিউটন ফেল আকর্ষকরণী/তুমি নারী আলফা বিটা গামা গামিনী"*; আবার কেউ লিখছেন, *"সুসংবাদ, আমি যদিও পুরুষ, তবুও গর্ভধারণ করিয়াছি। আমার এখন সাত মাস চলিতেছে। চালতার আচার খাইতেছি।"* খবরের কাগজে পড়া যায়, বস্তাবন্দী কিশোরীর মৃত্যুর কারণ – স্তন বড় করার তেল কিনেছিল সে, দোকানদার ওকে বলেছিল, নিজে নিজে মাসাজ করে লাভ নেই – অতঃপর মেয়েটি সন্তানসম্ভবা হয়, হাতুড়ের কাছে গিয়ে মারা যায়।

অনিকেত শুরু করে "সন্ধিক্ষণ" অনুষ্ঠান-জীব জগতের বিবর্তন, কোষ, ক্রোমোজোম, জিন, প্রজনন প্রক্রিয়ার বিবর্তন, মানব দেহ ও প্রজনন অঙ্গ, যৌনতা সম্পর্কিত কুসংস্কার, স্বাস্থ্যবিধি, নানা প্রশ্নের উত্তর, সাক্ষাৎকার, বিশেষজ্ঞের মতামত। আরো চিঠি আসে, আরো নানা সমস্যা – *"মহাশয়, আমি একজন পুরুষ, কিন্তু নিজের ওপর ঘৃণা হয়। কেবল মনে হয় আমি যদি মেয়ে হতাম, খুব ভালো হত"*।

বা, *"আমি হার পরেছিলাম বলে মা আমাকে মেরেছিল। কিন্তু বাড়িতে গোপাল ঠাকুর আছে। মা রোজ পুজো করে, গোপালকে সুন্দর করে সাজায়। ... গোপালও তো ব্যাটাছেলে। গোপাল সাজলে দোষ হয় না, আমি সাজলে দোষ হবে কেন ?"*

অনিকেত বহু জায়গায় যায় তথ্যের খোঁজে, চরিত্রের খোঁজে-কার্জন পার্ক, শিয়ালদা স্টেশন, মিডলটন রো'র গার্ডেন রেস্তোঁরা, পায়রাডাঙার কতিপয় "খৎনাকার", চেতলার হিজড়া ঠেক, বলরামবাটির হিজড়া মেলা, খাজাইতলা, এশিয়াটিক সোসাইটির একসিবিশনে বহুচেরা দেবীমূর্তি, ব্যাংককে বিবিসির ওয়ার্কশপ, পুরুলিয়ার কাঁদরবুরুর "বৈশাখী পূর্ণিমার উৎসব, আবার রবীন্দ্রসদনে কবিতা উৎসব .... নতুন সব শব্দ শেখে – "বাট্টু", "ধুরানি", "লিকম", "আকুয়া", "ছিবড়ি", কত অজানা তথ্য – টার্নার সিনড্রোম, ক্লাইনেফেলটার সিনড্রোম, ৪৫ x, ৪৭xy, ৪৮xxxy, কিনসের স্কেল, এবং অজস্র মানুষ- দুলাল, মন্টু, দুলালের মা, বিকাশ, আইভি, মঞ্জু, পরিমল, চয়ন, শিকস্তি, নাগেশ্বরী, চাত্তারা, তৃপ্তি, সোমনাথ, অনিকেতের স্ত্রী শুক্লা। প্রতিটি শব্দ, প্রতিটি চরিত্রর সঙ্গে জড়িয়ে থাকে গল্প, ইতিহাস, হা হা কান্না আর অনেকখানি অন্ধকার, ভয় – হয়ত নাগেশ্বরী এই ভয়কে ব্যাখ্যা করেন এভাবে, .... *"পাবলিককে ভয় দেখাবি কি দিয়ে ? অন্ধকার গুহা দিয়ে। অন্ধকার গুহা দিয়ে। ঐ কিছু নেই – কেই ওরা ভয় পায়"*।

ফ্যাক্ট আর ফিকশনের জোড়ের জায়গাগুলি হয়তো কোনো কোনো ক্ষেত্রে মিলেমিশে যায় নি, একটা মুহূর্তে, তথ্যের ভারে সামান্য ক্লান্তি এসেছিল – তখনি দুলাল মারা গেল আগুন জ্বালিয়ে আর এইভাবে লাইনগুলি এল-" দুলালের প্রস্টেটের সংক্রমনটা বেড়ে রক্তক্ষরণ হয়, ওর লুপ্ত যৌনাঙ্গের ভিতরে, গোপনে থাকা মূত্রছিদ্র দিয়ে বেরিয়ে আসে রক্ত। যেন এই রক্তস্রাবের জন্যই অপেক্ষা ছিল ওর। দুলাল ভাবল, ওর নারী হওয়া হয়ে গিয়েছে এতদিনে। জীবন পূর্ণ। এবার আগুন জ্বালো।"

অনিকেতের নিজের জীবনও কাহিনীতে ঢুকে যায় অবশ্যম্ভাবী। বাল্যবন্ধু মঞ্জু আসে ওর জীবনে, নিজের ছেলের সমস্যা নিয়ে – পরিমল মঞ্জুর ছেলে, যে নিজেকে পরি ভাবে। অনিকেত জড়িয়ে পড়ে সম্পর্কে। প্রথম মিলনের সময়ে মঞ্জু উপুড় হয়ে শোয়। অনিকেত ভাবে, *"সো ইউ আর দ্য কালপ্রিট, তোর জন্যই ছেলে এমন হয়েছে। তোর একস্ ক্রোমোজোমের খেলায় ? .... মঞ্জু কাতরে ওঠে। .... বলে, ইশ, কী ভীষণ কষ্ট। কাঁদতে থাকে। .... বলে, ছেলেটা কতটা কষ্ট পায় সেটা দেখছিলাম রে ডাবু। ভীষণ কষ্ট। কেন ও এসব করে ?"*

এ কাহিনী আপাত শেষ হয় পরি আর চয়নের মালাবদলে।

*"মালা বদল হয়। আকাশের মেঘে মেঘে বারতা আসে। পৃথিবীর দু কোটি ট্রানসেকসুয়াল এস এম এস পাঠায় .... বাপি ছবি তোলে, নিনা হাততালি দেয়। অনিকেতের মনে হয় ঐ হাততালির সঙ্গে মিশছে আরও শত সহস্র হাতের তালি। চাত্তারা, ঝুমকো, ময়নারা সব ঠিকরি দিচ্ছে, ভেঁপু বাজাচ্ছে। পরির বাবার দু চোখে জল গড়াচ্ছে। ....*

*উলু দিলো চাত্তারা, ফুলি, ময়নারা .... দুলালীও। উলু দিল কলাগাছ, জুইঁফুল, বাঁশের কুলো, নিভন্ত প্রদীপ।"*

(৩)

*মিনিস্ট্রি অফ আটমোস্ট হ্যাপিনেস*

ব্লার্ব অনুযায়ী, "দ্য মিনিস্ট্রি অফ আটমোস্ট হ্যাপিনেস" এক লম্বা আখ্যান – পুরোনো দিল্লির ঘিঞ্জি বসতি থেকে এই কাহিনীর সুতো চলে গেছে বড় শহর ছাড়িয়ে, কাশ্মীরে, মধ্যপ্রদেশের জঙ্গলে যেখানে war is peace and peace is war.

কাহিনীর অক্ষে অঞ্জুম-একদা আফতাব পরিচয় ছেড়ে যে এসেছিল খোয়াবগাহে। সেখানে তাকে নিম্মো গোরখপুরী বলে, "Do you know, why God made Hijraas? .... He decided to create something, a living creature that is incapable of happiness. so he made us." নিম্মো আরো বলে, সাধারণ মানুষের দুঃখ কিসে জানো? এই ধরো জিনিসের দাম বাড়ল, বাচ্চাকাচ্চাদের স্কুলের অ্যাডমিশন, স্বামীর চড় চাপড়, অথবা বৌএর ছলনা, কিম্বা দাঙ্গা, হয়ত যুদ্ধ – এসবই তো থিতিয়ে যায় সময়ের সঙ্গে। But for us the price-rise, and school admissions, and beating husbands and cheating wives are all inside us. The war is inside us. Indo-pak is inside us. It will never settle. It will never settle down.

এই খানেই সমস্ত কাহিনীর সুর বেঁধে দেওয়া। এ যেন অন্তহীন বিলাপ – বুক চাপড়ানো হাহাকার যেন – স্লো মোশনে সেই বিলাপ আমরা প্রত্যক্ষ করি কাহিনীর প্রতি লাইনে – কখনও অসংলগ্ন, কখনও কথা জড়িয়ে যায় কান্নায়, লালায়, আর রক্তে, আলজিভ দেখা যায় – কখনও তা অশ্রুত, কখনও পাগলের মত চিৎকার, কখনও ক্লান্তিতে স্বর নেমে যায়, কখনও তীব্র শ্লেষ, ঘুনঘুনে বিষাদ আর বুক চাপড়ানো। অজস্র চরিত্র এসেছে – তিলোত্তমা, নাগা, বিপ্লব, মুসা, অমৃক সিং, এক রহস্যময় শিশু উদয়া জেবেন, জয়নাব, সাদ্দাম হুসেইন, আজাদ ভারতীয়; এসেছে গুজরাট, যন্তর মন্তর, লাল কিল্লার লাইট অ্যান্ড সাউন্ড, পাগলি, কুকুরটা, রিগর মর্টিস হয়ে যাওয়া বন্ধ হাতের মুঠোয় মাটি আর হলুদ সর্ষে ফুল।

সাদ্দাম হুসেইন আসলে দুলিচাঁদ। বাবা দয়াচাঁদ। ব্যবসা ছিল মৃত গবাদি পশুর চামড়াশোধন। দশেরার দিন ওরা মৃত গরু নিয়ে ফিরছিল – পুলিশ টাকা চেয়েছিল অনেক – অত টাকা না দিতে পারায় গো হত্যার অভিযোগে গ্রেফতার হল দয়াচাঁদ, থানা থেকে তাকে বের করে আনল জনতা – অতঃপর জয় শ্রীরাম, বন্দেমাতরম – বীভৎসভাবে খুন হ'ল দয়াচাঁদ। সমস্ত খুইয়ে পালাল দুলিচাঁদ। সাদ্দাম হয়ে গেল। পরে সে ফিরে গিয়েছিল বাবার মৃত্যুস্থলে – সেখানে এখন শপিং আর্কেড।

This is his mazar, Anjum said.

....

May be it's the whole world's mazar, Tilo thought, but didn't say. May be the mannequin-shoppers are ghosts trying to buy what no longer exists.

....

I know a hindu prayer ! Zainab said suddenly .... And then, sitting at a table in a fast –

food restaurant, as a missive of love to her late as well as future father-in-law, Zainab recited ....

Om bhur bhuvah svaha

Tat savitir varenyam

Bhargo devasya dhimahi

Dhiyo yo nah prachodayat"

তরুণ সেনানী মুরুগেশন-কাশ্মীরে পোস্টিং হওয়ার পর দেখে ফর্সা কাশ্মীরিদের পাশে ভারতীয় সেনারা সকলেই চামার। তার মৃত্যুর পরে কফিন নিয়ে যেতে হয় তার গ্রামে অচ্ছুতদের জন্য নির্দিষ্ট শ্মশানে, ভারতীয় আর্মি শহীদ স্মৃতিতে মুরুগেশনের মূর্তি স্থাপন করে তাঁর গ্রামে-তথাকথিত উচ্চ শ্রেণী ক্রমে হাওয়া করে দেয় তার রাইফেল, তারপর হাত, মাথা। "The headless statue remained at the entrance of the village. Though it no longer bore any likeness to the man it was supposed to commemorate, it turned out to be a more truthful emblem of the times than it would otherwise have been.....In some countries, some soldiers die twice."

মিস জেবেন ১ আর তার মা মারা যায় এক সঙ্গে, এক বুলেটেই সম্ভবত। বাবাটি সন্তানের কবরে খোদাই করে দেন কটি লাইন – "বাবা, গল্প বলো।" Tell me a story and can we cut the crap about the witch and the jungle? There wasn't a witch, and she didn't live in the jungle.

উপদ্রুত কাশ্মীর। লাশের পর লাশ। সমাধির জমি অপ্রতুল। স্তরে স্তরে সাজানো হয় মৃতদেহ। যেমন টুরিস্টদের দোতলা বাস।

এ কাহিনী, এই ক্রন্দন শেষ হয় মিস উদয়া জেবেন ২-এর হিসিতে বিস্মিত রাতের আকাশ, তারা আর হাজার বছরের প্রাচীন শহরের প্রতিবিম্বে। গুবরে পোকা আকাশে হাওয়ায় ঠ্যাং তোলে আকাশ ধরবে বলে – 'to save the world in case the heavens fell'.

(৪)

*হাউ টু টেল আ শার্টার্ড স্টোরি*

আঞ্জুমের কারণে, এই লেখায় হলদে গোলাপ আর আটমোস্ট হ্যাপিনেসকে একসঙ্গে রাখি নি। এ' দুই মহা আখ্যানের মূল সুর, আমার কাছে, হাউ টু টেল আ শাটারড স্টোরি। এই খোলামকুচি জীবনের কাহিনী কেমন করে লেখা হয় ?

অবশ্যই স্বপ্নময়ের লেখা অসম্ভব ফোকাসড। কাদের নিয়ে লিখছেন, কেন লিখছেন – খুব পরিষ্কার। অরুন্ধতীর উপন্যাসে এক বিলাপ, হাহাকারকে স্লো মোশনে দেখছি যেন ; অশ্রু, ক্রোধ, খ্যাপামি, বুক চাপড়ানো খুব স্পষ্ট দেখতে পাই লাইনে লাইনে, পাতায় পাতায়। নিজের সন্তান, প্রেম, ঘরবাড়ি ছারখার হলে অসহায় মানুষ যা করে – গোটা উপন্যাসটা যেন তাই। আমার দেশ, আমারই দেশের মানুষ, আমাদেরই সন্তান সন্ততি – খবরের কাগজ পড়ে এক এক দিন আমার মত গা বাঁচানো মানুষ এই ভাবে কাঁদে। বিলাপই যখন, তার অসংলগ্নতা, অর্থহীনতা থাকবেই, খুব ফোকাসড তো সে হবে না। অন্য কথা আসবে – হয়তো ঐ শোকে যার আপাত কোন ভূমিকাই নেই – অসংলগ্ন অর্থহীন কথা; দার্শনিকতাও থাকবে, খানিকটা কল্পনা। যা হয় নি, যা হতে পারত। মনে পড়ে, আমার পিসিমা, পিসেমশাইয়ের মৃত্যুর পর কাঁদতে কাঁদতে বলেছিলেন – চশমাটা দিয়া দে। হ্যায় তো চোখে দ্যাখে না, ক্যামনে যাইব একা। এই সব ...

অরুন্ধতীর উপন্যাসে বাস্তব পরাবাস্তবের চলাচল আছে, রয়েছে দার্শনিকতা – শেষ লাইনে ঐ ঠ্যাং ওল্টানো গুবরে আর খুকীর হিসিতে দিল্লির বিস্মিত হওয়া যেন এক মহাকাব্যের সমাপ্তি; স্বপ্নময়ে তা অনুপস্থিত। দুই লেখার ভাষাও খুব আলাদা স্বাভাবিকভাবেই। তবু কোনো কোনো জায়গায় স্বপ্নময়ে উঁকি দিয়েছেন অরুন্ধতী। যেমনঃ হলুদ গোলাপে একটি আত্মহত্যার ঘটনার পরে কাতর দম্পতি। সেইদিনই আবার নতুন স্যান্ডুইচ মেকার কেনা হয়েছে সংসারে। একই সঙ্গে আত্মহত্যার কথা আবার স্যান্ডুইচ মেকারে সংসারের সুবিধের কথা চলছে। অমোঘ লাইন – "একেই ঘরকন্না বলে। সুইসাইড ও স্যান্ডুইচ সব মিশে যায়।" দুই উপন্যাসের উপকরণগুলি আমাকে অবাক করেছে। কেউ কিচ্ছু ফেলেন নি। কিচ্ছু না। সমস্ত উপকরণ – যা প্রথাগত উপন্যাসের উপকরণ হতে পারে বলে ভাবাই যায় না – সব

রয়েছে। হলদে গোলাপে অনিকেতের ফাইলের চিঠিপত্র, নোট, ইতিহাস, মিথ, পুরাণকথা, হ্যান্ডবিল, সিলেটের "সুন্দরী কমলার" আখ্যান, বররুচির "উভয়সারিকা", অতীতের আলেকজান্দ্রিয়া বন্দরের ক্যাস্ট্রেশন থেকে হিজড়া খোলে ছিন্নি পর্যন্ত, বাকাবিল্লাহ , ফানাবিল্লাহ, স্কপ্টসি।

ধরা যাক, "প্রবর্তক" পত্রিকায় পরির কবিতা –

*"মা বোঝে না, কেউ বোঝে না*

*কোথায় আমার আমি"*

বা

প্রেমার্থ কবির কবিতা –

"তোমায় নিয়ে চাঁদে গেছি/চাঁদেতে কম জি/তোমায় আমি কাঁধে নিয়ে কেবল লাফাচ্ছি"

পাশাপাশি যশোধরাও রয়েছেনঃ

*"সমুদ্রের তলে এই খেলা*

*যাপনে যাপনে। জলে জল।*

*আলাদা আলাদা করে কী করে সে*

*বলে দেবে বলো*

*কোনটা জননক্রিয়া, কোনটা প্রণয়*

*কোনটা ছল।"*

চিরকুট, ছেঁড়া কাগজ, নোটস – যা ঘরময় উড়ে বেড়ানোর কথা – সব বাঁধা পড়েছে দুই মলাটে – আখ্যানের উপকরণ হয়ে।

অরুন্ধতীর উপন্যাসে রয়েছে, তিলোত্তমার নেওয়া নোট – তার মায়ের মৃত্যুশয্যার আপাত প্রলাপ – Mostly they were pure gibberish. Somehow the idea of dictating things, Tilo said, seemed to make her mother feel that she was still the captain of the ship, still in charge of something, and what calmed her down considerably.'

রয়েছে The Reader's Digest Book of English Grammar and Comprehension for Very Young Children by S. Tilottamaa – যাতে থাকে গুচ্ছের ক্লিপিং অণুগল্প, আর কিছু নিছকই ডায়ারি এন্ট্রি –

দুটি উদাহরণঃ

১। khaadijaa says ... In kashmir when we wake up and say 'Good Morning' what we really mean is 'Good Mourning'

২। Nothing – I would like to write one of these sophisticated stories in which even though nothing much happens there's lot to write about. That can't be done in kashmir. It's not sophisticated, what happens here. There's too much blood for good literature.

Q1. Why is it not sophisticated?

Q2. What is the acceptable amount of blood for good literature?

রয়েছে ওসিপ মান্দেলস্টামের কবিতা –

A star melts, like salt, in the barrel

And the freezing water is blacker,

Death cleaner, misfortune saltier,

And the earth more truthful, more awful.

এভাবেই বুঝি লিখতে হয় আশ্চর্য বিলাপ –

'How to tell a shattered story?

By slowly becoming everybody.

No

By slowly becoming everything.'

খোলামকুচি জীবন লিখতে গেলে তবে কি খোলামকুচিই লাগে?

(৫)

*বর্ষণের ভাষা*

In what language does rain fall over tormented cities? - Pablo Neruda

আখ্যানদুটি এক সাধারণ পাঠককে সম্পূর্ণ অন্য জগতে নিয়ে যায় – অলীক নয়, পরাবাস্তব নয়, আমাদেরই পৃথিবী, আমাদেরই প্রতিবেশী, আমাদেরই ঘরের মানুষ সব। সাজানো বাগানে জল দিতে দিতে যেমন ঝড়ের মুখে পড়ে সুখী মানুষ। বিকেলের রোদ, সামান্য মেঘ, সবুজ ঘাস, চেনা ফুল, ফল, টিয়াপাখি, ঝরা পাতা, আগাছা, জলঝারি। তারপর আকাশ কালো করে আসে। প্রথমে মেঘলা। তারপর কালো, এবং নিকষ। মুহুর্মুহু বেগুণী বিদ্যুৎ। শুকনো পাতাগুলি দৌড়োতে শুরু করে রাস্তার এপার থেকে ওপার। কোথায় যেন কুকুর কেঁদে ওঠে। পাখিরা আর কোথাও নেই। ধুলো, পাতা, ভাঙা ডাল ঘিরে ধরে সুখী মানুষকে। জলের ফোঁটার এত জোর ? নাকি শিলাবৃষ্টি ? গাল কেটে যায়, চোখ মুখ বন্ধ ধুলোয়, চাবুকের মত গায়ে মুখে জল, পাতা। মাথার চুল বাইছে গাছ পিঁপড়ে, প্রজাপতিগুলি শুয়োপোকায় আমূল বদলে গিয়ে কাঁধে ঘাড়ে ঝরে পড়তে থাকে। আকাশ খুলে যায় মাথার ওপর। স্বর্গ না কি নরক ? হাওয়া উড়িয়ে নিয়ে যায় তাকে। নিজের ঘরবাড়ি অচেনা লাগে তখন। এই তো বাড়ি, এই তো মালঞ্চঘেরা বাড়ি ছিল একটু আগেই, ঘোর আঁধারে হারিয়ে গেছে বাড়ি। ঝড়ের ব্যাদান মুখে এ এক অন্য পৃথিবী – পাখি নেই, ফুল নেই, মানুষ নেই, কূজনহীন কাননভূমি, দুয়ার দেওয়া সকল ঘরে। অসম্ভব খিদে পায় তখন তার – ঝড়ের খিদে। ঝড়ের দিকে মুখ করে, হাঁ করে সে ঝড় খায় তখন। হাওয়া, ধুলো, জল, পাতা, শিলা, শুঁয়োপোকা, পিঁপড়ে এবং বজ্রমাণিক।

সিদ্ধার্থ দে

# শাক সবজির অবমাননা

ক্যানবেরার সমস্যাহীন সুবিন্যস্ত জীবনের মধ্যেও একটা অভাব বড় বেদনা দেয় – ভালো আড্ডা। যেটা শ্যামবাজারের রকে, বা কফি হাউসে, বা খড়গপুরের চায়ের দোকানে প্রায়শই পেয়েছি। ভালো আড্ডার সংজ্ঞা দেওয়া কঠিন – ব্যাপারটা একটা অনুভূতি বা উপলব্ধি। যেমন একটা দারুন খাবার পর মনে হয় – বেশ খেলুম।

দিনকয়েক আগে এক অ্যাডিলেড শহরবাসী অপরিচিত মূলস্রোত অস্ট্রেলিয়ান ভদ্রলোক আমাকে friend request পাঠিয়েছিলেন ফেসবুকে। অনুরোধ গ্রহণ করার পর আমি জানতে চেয়েছিলাম হঠাৎ আমাকেই বন্ধুত্বের অনুরোধ পাঠালেন কেন ? উত্তর শুনে কলকাতা- বাসীরা বেশ খুশী হবেন – ওনার নাকি আমাদের শহরটির মেজাজটা দুর্দান্ত লাগে। বার তিনেক ঘুরে গেছেন। অস্ট্রেলিয়াতে একজন ফেসবুকে সক্রিয় কলকাতার মানুষ খুঁজে পেয়ে আলাপ করতে আগ্রহী হয়েছেন। আমায় প্রশ্ন করলেন কলকাতায় ঘন ঘন যাই কেন। কবুল করলাম স্রেফ আড্ডার লোভে।

এই আড্ডা ব্যাপারটার কোন পশ্চিমী প্রতিশব্দ বা চলনসই সংজ্ঞা আমার জানা নেই। কথাটার মধ্যে অনেক সময় একটা লঘু বাক্যালাপের ইঙ্গিত থাকে। সেটা কিয়দংশে সত্যি হলেও অবশ্য সব সময়ে নয়। কিছু পছন্দের মানুষের সঙ্গে যখন আড্ডায় বসি আলোচনার বিস্তার জীবনদর্শন থেকে মানবজাতির বিবর্তনের ইতিহাস ইত্যাদি নানা বিষয়ে সাবলীল ভাবে বিচরণ করে।

এ লেখা অবশ্য এক লঘু বিষয়ে – যেটির অনুপ্রেরণা বছর খানেক আগে এক জমায়েতে। কেউ প্রশ্ন তুলেছিল – আমাদের ভাষায় শাক সবজি, ফল মূল নিয়ে এত বিরূপতা কেন ? বিষয়টা নিয়ে কোনদিনও সেভাবে ভাবিনি – তবুও বেশ কয়েকটি উদাহরণ চটপট মাথায় এলো। কিছু খোশগল্পও মনে পড়ল।

যেমন : মৃত্যু একটা দুঃখজনক কিন্তু মানবজীবনের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। সেটি "পটল" তোলা কেন? এক পণ্ডিত বন্ধু এই রহস্যে কিছুটা আলোকসম্পাত করেছেন। ফলবান পটলগাছের সমগ্র পটল একসাথে তোলা হলে পটল গাছটির মৃত্যু হয়; তাই পটল তোলার মানে মৃত্যু। চোখের অপর নাম অক্ষিপটল – মৃত্যু হলে চোখ বা অক্ষিপটল উপরের দিকে উল্টে যায়; তাই পটল তোলা দ্বারা মৃত্যুকে বোঝায়। মৃত ব্যক্তির পট বা পরিধেয় বস্ত্র তুলে রাখতে হয়; সেই পট তোলা কালক্রমে পটল তোলা হয়েছে। আমাদের হুগলির আদি বাড়ির কূলপুরোহিত ছিলেন পটলঠাকুর। পল্লীর বহু মানুষের পটল তোলার পর সেই পটলঠাকুরই শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে পৌরাহিত্য করেছেন।

এই "পটল তোলা" নিয়ে স্কুলজীবনের একটা ঘটনা মনে পড়ল। বাংলার মাস্টারমশায় রায়চৌধুরী স্যার "তিনি মারা যাইতেছেন" বাক্যটি অর্থ বজায় রেখে বিভিন্ন ভাবে লিখতে বলেছেন। এক দুষ্টু সহপাঠী "তিনি পরলোকের পথে", "তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিতে চলিয়াছেন"এর সাথে লিখেছিল: "তিনি ধীরে ধীরে পটল তুলিতেছেন!" সুরসিক রায়চৌধুরী স্যার মজা পেলেও কপট গাম্ভীর্য বজায় রেখেছিলেন সেদিন।

বেগুন ভাজা এক অতি সুস্বাদু খাবার – বিরক্ত হলে টেনিদা কেন "বেগুন ভাজার " মত মুখ করতেন ?

ঢ্যাঁড়স এক সুদৃশ্য সবজি – সাহেবরা বেশ একটা রোমান্টিক "লেডিস ফিঙ্গার" নাম দিয়েছেন। আমি কিন্তু পারলেই অপছন্দের কাউকে ঢ্যাঁড়স বলি।

ছেলেবেলার শীতের মরশুমের ফুলকপি ভাজার সুঘ্রাণ এখনো পাই – সেই সবজির খুড়তুত ভাই বাঁধাকপি কেন পাঞ্জাবীদের মস্তক শোভিত করে ?

আর যে তেঁতুল জল না হলে আমাদের প্রিয় ফুচকার স্বাদ-ই খোলে না, সেই নামে কেন আমরা দক্ষিণ ভারতীয়দের কিঞ্চিৎ নেতিবাচক অর্থে অভিহিত করি ? শ্রীলঙ্কায় শুনেছি সিনহালিসদের সঙ্গে তামিল টাইগারস নামক জঙ্গী সংগঠনটির খুব একটা সুসম্পর্ক ছিলনা। সিংহলীরা যদি বুনো ওল হয় তামিল টাইগার্সরা কি বাঘা তেঁতুল ?

এঁচোড় খেতে বেশ। ভাল করে রাঁধলে বেশ মাংস মাংস লাগে। সেইজন্যই বোধহয় বস্তুটির আর এক নাম "গাছপাঁঠা"। তবে "এঁচোড়ে" পাকা ছেলেদের খুব একটা ভাল চোখে দেখা হয়না। সবজিটি পাকলে কাঁঠাল হয়। আমার অবশ্য বিশ্রী লেগেছে কাঁঠাল জিনিসটা যে দু একবার খেয়েছি – তবে এত ফল থাকতে এই গাছে থাকা কাঁঠালকেই প্রচলিত প্রবাদে অলীক আশার প্রতীক হিসাবে বেছে নেওয়া হল কেন জানিনা। আবার কাউকে প্রচণ্ড প্রহার করাটাকে বলা হয় "কিলিয়ে কাঁঠাল পাকানো"।

শাকসবজি সংক্রান্ত সব উপমা অবশ্য নেতিবাচক নয়। প্রেমের মত মধুর অনুভূতিকে কাঁঠালের আঠার সঙ্গে তুলনা করা হয় – লাগলে পরে যা নাকি চট করে ছাড়ে না ! "ধানি লঙ্কা" উপমাটি ভাল মন্দ দুই অর্থেই ব্যবহৃত হতে দেখেছি। আর এক সুন্দরীর "পটল চেরা চোখ" তো "স্ত্রী" ছবিতে এক লম্পট জমিদারের ভূমিকায় অভিনয় করা মহানায়ক উত্তমকুমারকে "চাক্কু" মেরেছিল !

টুকটুকে লাল মুলো দেখতে চমৎকার। মূলোর ছেঁচকি তো অতি সুস্বাদু লাগে আমার। তবুও কাউকে "রাঙা মুলো" বলাটা খুব একটা প্রশংসাসূচক নয়।

দুটি মানুষের অসদ্ভাব থাকলে কেন সম্পর্কটি "আদায়-কাঁচকলায়" আখ্যা পায় ? আর বুড়ো আঙুল তুলে "কাঁচকলা" দেখানো আমাদের সংস্কৃতিতে খুব একটা শোভন না হলেও পশ্চিমী দুনিয়ায় একই ভঙ্গিমার অর্থ "সব ঠিক হ্যায়"। অধিকাংশ সময়ে বাজারে আদার দেখি আগুন দাম – তবে কেন যে সাধারণ মানুষকে "আদার ব্যাপারী" আখ্যা দিয়ে জাহাজের ব্যবসা থেকে দূরে থাকার উপদেশ দেওয়া হয় জানি না।

গাজর নিয়ে কোন উপমা বাংলায় জানা নেই, তবে ইংরেজিতে লোভ দেখানো বোঝাতে চালু কথা "dangling a carrot!"

আমার পরিচিত একটি যুবক ক্লাস নাইনে পড়ার সময়ে এক গৃহশিক্ষকের কাছে পড়তে যেত। মাস্টারমশাইয়ের পড়ানোর ঘরে একটা আলু রাখা থাকত। তিনি প্রতিদিন আলুতে একটা ধূপকাঠি গুঁজে সেটা জ্বেলে পড়ানো শুরু করতেন। আলুটা নষ্ট হয়ে গেলে উনি ওটা ফেলে নতুন একটা আলু নিয়ে আসতেন। স্যার একদিন ছাত্রকে বলেছিলেন আলুটা পাশের পুকুরে ফেলে আসতে। আলুটা নিয়ে ছেলেটি যখন দরজার দিকে এগোচ্ছে এক সহপাঠী তখন সবেমাত্র এসেছে। সে জিজ্ঞেস করল, "কোথায় চললি রে ?" ছেলেটি চটপট উত্তর দিয়েছিল "মাস্টারমশাইয়ের আলু বিসর্জন দিতে"। প্রথমে মাস্টারমশাই এবং পরে বাবার কাছে সেদিন উত্তম মধ্যম খেয়েছিল ছেলেটি। একটা নিরীহ উক্তির জন্য ছেলেটি অকারণে মার খেল !

আলুভাতে আমার প্রিয় খাবারের অন্যতম। কিন্তু কোন কাজের নয় এমন কাউকে আলুভাতে বলেন অনেকে। শুনেছি ডায়াবিটিস রোগীদের এই অতি উপাদেয় আলুভাতে পদটি বিষবৎ পরিত্যাজ্য। মোদ্দা কথা হল: সুস্বাস্থ্যের জন্য এই আলুভাতে একেবারেই কাজের নয়।

যৌবনকালে গোলগাল ফর্সা সাদামাটা দেখতে মেয়েদের আমরা "আলুভাতে মার্কা" তকমা লাগাতাম। আসলে এই আলু জিনিসটার চেহারায় চকচকে বেগুন বা টাটকা ফুলকপির চটক নেই। সেটাই হয়ত এই বিশেষণের সূত্র !

আরও অনেক উদাহরণ দিয়ে এই লেখা দীর্ঘায়িত করতে পারতাম। কিন্তু বেচারা আলুর কথা দিয়েই শেষ করছি। আমাদের যেমন ভাত, জার্মানদের নাকি মূল খাদ্য আলু। কিন্তু এক বিশেষ দোষে দুষ্ট পুরুষদের আমরা বলি "অমুকের আলুর দোষ আছে"। পন্ডিৎ মানুষজন অনেক পরিশ্রমে, সাধনায় ডক্টরেট উপাধি (পিএইচডি) অর্জন করেন। আর আমরা কিছু নারীসঙ্গলোভী দুষ্টু লোককে "পটেটো হাইলি ডিফেকটিভ" আখ্যায় ভূষিত করি। খুব, খুব অন্যায় !

মলয় ব্যানার্জী

# নারীদিবস

বিগত ৯ই মার্চ অর্থাৎ নারী দিবসের পরের দিন আমাদের অফিসের সিনিয়র শ্রদ্ধেয় সৌমিত্র স্যার কাজের ফাঁকে বললেন — ওহে মলয়, একটা ঘটনা বলছি শোনো, গতকাল নারী দিবস উপলক্ষ্যে আমার এক বোনের অফিস তাদের মহিলা কর্মচারীদের জন্য পর্যাপ্ত খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করেছিল । সমস্ত বিল অফিস মিটিয়েছে । অফিস থেকে ফিরে, এই খাওয়া-দাওয়ার ঘটনা যখন আমার বোন অতি উৎসাহের সঙ্গে আমাকে বলছিলো, তখন আমি ওকে বলেছিলাম এতে আনন্দ পাওয়ার কিছু নেই । যদি তোরা মেয়েরা চাঁদা তুলে বাকি সবাইকে খাইয়ে দিতিস তাহলেই নারী দিবসের সার্থকতা প্রমাণ হতো । আমার এই কথার প্রত্যুত্তরে বোন আমাকে বললো সেকি, ফ্রী তে খাওয়াচ্ছে আর খাবো না ? আমার স্ত্রী বলে উঠলো তোমার দাদার ওই রকম বুদ্ধি !

এই পর্যন্ত পড়ে পাঠক মনে করতে পারেন যে আমি হয়তো সেই চিরাচরিত প্রথায় মহিলাদের সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলোকে নিয়ে প্রহসন করতে বসেছি, কিন্তু আসলে আমার উদ্দেশ্য তা নয় । আসলে এই কথাগুলো যদি আমি প্রকাশ্য সমাবেশে বলতে যেতাম তাহলে মার খাওয়ার সম্যক সম্ভাবনা ছিল । তাই ভাবলাম, বলার থেকে লিখে জানাতে পারলে অন্তত সেই সম্ভবনা থাকে না । আর গালাগালি যেটা খাওয়ার সেটাও এই লেখা ছাপার অপরাধে সম্পাদক মশাইয়ের সঙ্গে ভাগাভাগি হয়ে যেতে পারে ।

১৮৫৭ সালে নিউ ইয়র্কের সুতো কারখানার মহিলারা তাদের প্রাপ্য মজুরি পুরুষের সমান করার দাবিতে একটি মিছিল করেছিলেন, সেই শুরু । এরপর জার্মান সমাজতান্ত্রিক নেত্রী ক্লারা জেটকিনের নেতৃত্বে ১৯০৯ সালে প্রথম নারী সম্মেলন এবং জাতিসংঘের আহ্বানে ১৯৭৫ সাল থেকে ৮ই মার্চ দিনটির আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসেবে স্থায়ী ভাবে পালন ।

এখানে নারী দিবসের ইতিহাস লেখা আমার উদ্দেশ্য নয় । আসলে আমি সবসময় মনে করি ''আত্মমর্যাদা বোধের পালন'' এই বিষয়টাই হতে পারে এই বিশেষ দিনটির সার্থক উদ্‌যাপন । আমি মননে কারো থেকে ছোট নই, ফ্রী তে বা কোটার মাধ্যমে কিছু পাওয়া বা পাইয়ে দেওয়ার মাধ্যমে, ভোট রাজনীতির অভিসন্ধি থাকতে পারে কিন্তু তাকে আর-যাই-হোক সম্মান প্রদর্শন বলে না । পিক অফিস টাইমে প্রচন্ড ভিড় মেট্রোয় বয়স্ক মহিলা যাত্রী মহিলাদের জন্য নির্ধারিত সিটের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে, কলেজ পড়ুয়া একটি মেয়ে কানে হেডফোন লাগিয়ে বসে বসে বয়স্ক মহিলা যাত্রীকে বলছেন — ঐদিকে সিনিয়র সিটিজেনদের সিট আছে, ওদিকে চলে যান । জেনারেল এরিয়ার ওই ভিড় ঠেলে সিনিয়র সিটিজেনদের সিটের দিকে যাবার ক্ষমতা যে ওই মহিলার নেই, সেই চেতনাটাই মননে শুদ্ধ থাকার পরিচয়, এটাই আত্মমর্যাদার বিশেষত্ব । দুর্ভাগ্যজনকভাবে এগুলো প্রায় প্রতিটি নিত্যযাত্রীর নিত্যদর্শনীয় ঘটনা ।

অবশ্যই শারীরিক কারণে পুরুষের তুলনায় পিছিয়ে বলে মহিলাদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা প্রশাসকের আশু কর্তব্য । কিন্তু এটাও মনে রাখা জরুরি যে অকারণ প্রগলভতা প্রদর্শন ক্ষেত্রবিশেষে বিরক্তিই সৃষ্টি করে । আগুন হোমযজ্ঞেও জ্বালানো হয় আবার চিতাতেও । একটা পবিত্র আর একটা ভয়ানক । এই পার্থক্যটা ভুলে গেলেই মুশকিল । সিনেমা-থিয়েটার এগুলো মানুষের মনে যথেষ্ট প্রভাব তৈরি করে একথা অনস্বীকার্য । অথচ দেখুন সেই টিভি সিরিয়ালগুলোই টি.আর.পি তে এগিয়ে, যেগুলোতে পারিবারিক বা পরিবার বহির্ভূত কুটকাচালির বাড়াবাড়ি । শাশুড়ি-বৌয়ের খেউড়, কিংবা জা-ননদের চুলোচুলি অথবা একটি পুরুষের দুটি বৌ ও ষোলটি অবৈধ সম্পর্ক, এবং মজার ব্যাপার এই নিয়ে কোনো মহিলারই কোনো অভিযোগ নেই । যে মহিলা প্রযোজক, তিনি বলছেন লোকে খাচ্ছে ভালো, যে

মহিলা অভিনয় করছেন তিনি বলছেন পেমেন্ট ভালো আর যে মহিলা দর্শক তিনি বলছেন সময়টা কাটছে ভালো। অর্থাৎ আত্মমর্যাদাকে মারো গুলি। নো খারাপ লাগা। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে মহিলাদের জন্য পঞ্চায়েত স্তরে কোটা তৈরি, অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ না করে সব মহিলাদের জন্য বিশেষ আর্থিক ভাতা নিরূপণ এসবগুলিই যে আসলে ধীরে ধীরে আত্মমর্যাদাবোধকে হারিয়ে দিচ্ছে এটা যত তাড়াতাড়ি উপলব্ধি করা যায় ততই মঙ্গল।

ভাষার ক্ষেত্রেও কিছু শব্দের ব্যবহারের পরিমার্জনের মাধ্যমে মনে হয় পুরুষ ও নারীর সমত্বকে গুরুত্ব দেওয়া সম্ভব। যেমন অধ্যাপক থেকে অধ্যাপিকা, বিধায়ক থেকে বিধায়িকা ইত্যাদি। আচ্ছা বৈজ্ঞানিক থেকে বৈজ্ঞানিকা বলা হয়না ? এও ধরনের পদবাচক বিশেষ্য গুলির প্রয়োগে যদি অকারণ লিঙ্গান্তর না করা হয় তাহলে সেটা অনেক বেশি শ্রুতিমধুর ও কার্যকরী। অনেকে হয়তো বলতে পারেন তিনশো বছরের ইংরাজির লেজ এখনো ছাড়তে পারিনি, কিন্তু এটাও ঠিক যে, শব্দ চয়নের একটা ধারা যদি পুরুষ ও নারীর সমত্বকে গুরুত্ব দেয় তাহলে সেটা খারাপ কোথায়।

উপসংহারে বলি নারী হল সমাজের অর্ধেক অংশ, তাদের স্বয়ংসম্পূর্ণতা প্রকাশে সাহায্য করা রাষ্ট্রের অবশ্য কর্তব্য, কিন্তু সেই নারীদিবস তখনি পূর্ণতাপাবে, যখন আলাদাভাবে নারীদিবস পালন করাটার আর কোনো প্রয়োজন হবে না।

# শকুন্তলা চৌধুরী

## পুতুলখেলার ইতিকথা

সুজাতা চলে যাওয়ার পরেও ওর কথাগুলো মনের মধ্যে ঘোরাফেরা করছে রূপসার। সুজাতা হরি কৃষ্ণমূর্তি আর রূপসা সেন। কলেজজীবনের অভিন্নহৃদয় বন্ধু। যদিও এখন চার-পাঁচ বছরে একবার দেখা হয় কি হয় না। রূপসা এখন প্রবাসী ভারতীয় হয়ে গেছে। অক্সফোর্ডে গিয়েছিল ইংরেজী সাহিত্যে উচ্চশিক্ষা প্রাপ্তির জন্য, আর ফেরা হল না। সাহিত্য ও সমাজের ওপর গবেষণা শুরু করল বিদেশে বসে, বিয়ে করল না। আর সুজাতা গ্র্যাজুয়েশনের পর কলকাতা ছেড়ে দিল্লীতে চলে গেছে। এখন একটা নামকরা কাগজের অর্থনৈতিক রিপোর্টার। তাই এখন সেই প্রবচনের মতো – "নদীতে নদীতে দেখা হয়, তবু ....."

প্রথমবার যখন দেশে এসেছিল রূপসা, সুজাতা তখন সদ্য মা হয়েছে। ও কলকাতায় আসতে পারেনি আর রূপসাও দিল্লী যেতে পারেনি – বিদেশ থেকে প্রথমবার আসা, আত্মীয়স্বজনদের বাড়ীতে বহু জায়গায় নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে হয়েছিল সেবার। তার পরের বার অবশ্য কিছুক্ষণের জন্য হলেও দেখা হয়েছিল। বম্বের বদলে সেবার দিল্লী দিয়ে ঢুকেছিলো রূপসা, আর কলকাতার ফ্লাইট নেওয়ার আগে যে কয়েক ঘন্টা হাতে ছিল সেটার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেছিল দু'জনে এয়ারপোর্টে বসে চুটিয়ে আড্ডা দিয়ে।

তারপর আবার দীর্ঘ কয়েকবছরের ব্যবধান। রূপসা ততদিনে সামাজিক গবেষণায় নাম করেছে এবং লেখালিখিতে হাত পাকিয়েছে। এবারে ও কলকাতায় এসেছে শুধু মা-বাবার সঙ্গে বাড়ীতে বসে ছুটি কাটাতে। যদিও মনে আশা আছে যে এবারেও কলকাতা ওকে নিরাশ করবে না – এই প্রাণচঞ্চল ঘটনাবহুল শহর ওর লেখা এবং গবেষণার কিছু উপাদানও অবশ্যই সরবরাহ করবে, প্রতিবারের মতো। "ইউ আর নেভার টু ওল্ড টু লার্ন সামথিং ফ্রম ইওর পেরেন্টস্ এ্যাণ্ড ইওর মাদারল্যাণ্ড, রূপসা সেন !" এয়ারপোর্ট থেকে বাড়ী আসতে আসতে নিজেকেই নিজে বলল রূপসা।

সুজাতা বলেছিল ও একটা কাজে দু'দিনের জন্য কলকাতায় আসছে, ক্রিসমাসের ঠিক আগে, তখন দেখা হবে। ওর মেয়ে সেই ক'দিন সুজাতার স্বামীর কাছে থাকবে – সেই সুযোগে সুজাতা ঘুরে যাবে। সুজাতার মেয়ে শ্রেয়া পছন্দ করে না সুজাতার স্বামীর কাছে যেতে, বাবার নতুন গার্লফ্রেণ্ডও যে তাকে পছন্দ করে না সেটাও ও বুঝতে পারে। কিন্তু সুজাতা ওকে বুঝিয়েছে 'ভিজিটেশন্ রাইট'-এর নিয়ম। যেতে হবেই, কিছু করার নেই !

সুজাতার মা-বাবা এখন বম্বেতে থাকেন ওর দাদার সঙ্গে। ওনারা সবাই সুজাতাকে বলেছিলেন স্বামীর সঙ্গে মিটমাট করে নিতে, সুজাতা কানেও তোলেনি। ও এবার কলকাতায় এসে বালিগঞ্জের একটা হোটেলে উঠেছে। রূপসা বলেছিল ওর সঙ্গে এই বাড়ীতেই থাকতে, সুজাতা রাজী হয়নি। তবে রবিবারের সারা দিনটা ওর সঙ্গে কাটাবে কথা দিয়েছে। এই বাড়ী সুজাতার চেনা, সেই কলেজজীবন থেকে। রূপসা সাতদিন ধরে অধীর অপেক্ষায় – কতক্ষণে সুজাতার সঙ্গে দেখা হবে !

আজ পুরোনো দিনের মতো ঘরের দরজা এঁটে দুই বন্ধু সারাদিন গল্প করেছে।

গল্পের অনেকটা জুড়ে ছিলো সুজাতার বর্তমান জীবনের টালমাটাল। সুজাতা হরি কৃষ্ণমূর্তি, যে কিনা বিয়ের পর হয়ে গিয়েছিলো সুজাতা শিবা সুব্রামানিয়ম, এখন বিবাহ বিচ্ছেদের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। কারণ সেই চিরকালীন – সুজাতার স্বামীর জীবনে দ্বিতীয় নারীর আগমন। এবং বেশ ক্ষমতাসম্পন্ন দ্বিতীয় নারী, যার বাবাকে দিল্লীর রাজনীতিতে সবাই একডাকে চেনে। বলা বাহুল্য, সুজাতা সেটা মেনে নেয়নি এবং স্বামীকে বাধ্য করেছে মোটা ক্ষতিপূরণ সমেত বিবাহবিচ্ছেদ দিতে। দুই উকিলে কথা চলছে, মাস দুয়েকের ভেতরেই সব চুকে যাবে বলে মনে হয়।

রূপসা হাওয়াটা হাল্কা করার জন্য হেসে বললো – "তবে আর কি? তুই যা গ্ল্যামারাস্, দু'দিনে নতুন বর পেয়ে যাবি। রাজীব মেহতা তো এখনও তোর অপেক্ষায় আছে, বিয়েই করলো না। ওকে বিয়ে করে নে'। সঙ্গে তুই টাকাও পেলি। তোরই লাভ! ... ডিভোর্স এখন তো রোজের ব্যাপার রে। ভেবে কি করবি ? মুভ অন্।" কলকাতায় বড়ো-হওয়া চোস্ত বাংলা-বলা সুজাতা একটু তিক্ত গলায় বললো – "না রে, আমার এখন মেয়েকে বড়ো করাটাই প্রধান লক্ষ্য। যতদিন না মেয়ে কলেজে যাচ্ছে ততদিন অন্য কিছু ভাবার সময় নেই, বিয়ে করারও ইচ্ছে নেই। মেয়ে স্টেটসে যেতে চায়, তার প্রিপরেশন্ আছে। ওকে হাইস্কুলের দুটো বছর ইন্টারন্যাশনাল স্কুলে দেব ভাবছি। অনেক টাকার ব্যাপার, শিবার সঙ্গে রোজ ফাইট হচ্ছে এই নিয়ে। হি ইজ সো সেলফিশ – বলছে ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের দরকার নেই, স্টেটস্ যেতে হবে না ... হি ওনলি থিঙ্কস্ এ্যাবাউট হিমসেল্ফ! বড়লোক পলিটিশিয়ন শ্বশুরকে ধরে রিয়েল ইস্টেট বিজনেসে লাল হয়ে গেল, কিন্তু মেয়েকে পড়াতে বেশী টাকা লাগলে সে দিতে পারবে না। ক্যান্ ইউ ইম্যাজিন্ ? ইনফ্যাক্ট সব ছেলেরাই বোধহয় সেলফিশ। আয়াম্ সারপ্রাইজড টু সি হাউ সেলফিশ মেন ক্যান বি! আয়াম্ নট স্টাক অন্ দ্য ডিভোর্স, আয়াম্ ম্যাড এ্যাবাউট দিস্ সেলফিশনেস্ – ইটস্ নট হিউমেন। মেন ক্যান ওনলি ব্রেক উইমেন, ক্যান নট মেক এনিথিং বেটার আউট অফ দেম্। দ্যাটস্ হোয়াই দে ডোন্ট ডিসার্ভ উইমেন্ ... রাদার, উইমেন ডিসার্ভ বেটার! ... ইউ নো মাই কলিগ রিচা, রাইট? শী ইজ নাউ ওপেনলি লিভিং টুগেদার উইথ হার গার্লফ্রেণ্ড বিয়াস্। মেয়েরাই মেয়েদের বোঝে, টেক কেয়ার করতে পারে ... এ্যাটলিস্ট এই জেনারশনে! লাস্ট সেঞ্চুরীতে শাশুড়ীরা বৌদের ঝামেলা দিত, বাট দ্যাট কেম্ ফ্রম ইনসিকিউরিটি এ্যাণ্ড এ পিকিউলিয়র সোশ্যাল প্র্যাকটিস্ দ্যাট ওনলি ভিকটিমাইজড উইমেন। দে ডিডন্ট নো এনি বেটার। এখন অন্য ব্যাপার। মেয়েরা এখন নিজেরাই নিজেদের জীবনের স্টিয়ারিং হাতে তুলে নিয়েছে – নো শ্বশুরবাড়ী বিজনেস্। এ্যাণ্ড নাউ দে হ্যাভ টু বি বেটার – কনফিডেন্ট, সাপোর্টিং। ওয়ার্কিং উইমেন নিড কম্প্যাশন্ প্লাস সাপোর্ট, এ্যাণ্ড ওনলি উইমেন ক্যান প্রোভাইড দ্যাট। তুই তো সোসাইটি নিয়ে রিসার্চ করিস্ – তোর মনে হয় না যে দেয়ার মাস্ট বী এ রিজন্ হোয়াই দ্য নাম্বার অফ হোমোসেক্স্যুয়াল উইমেন ইজ ইনক্রিজিং বাই দ্য ডে?"

রূপসা একটু হাসল। যদিও ও জানে যে সুজাতা তিক্ত এবং ক্রুদ্ধ হয়ে কথা বলছে, তবু ওর কথাটা ভাবালো রূপসাকে। এই শতকের মেয়েরা বাইরের জগতে জোর কদমে এগিয়ে যাচ্ছে, ঘরে এসেও যদি তাদের লড়তে হয় তাহলে চলবে কি করে? তাদের সেবা, তাদের শান্তির কথা কে ভাববে? ... চমক ভাঙলো সুজাতার কথায়। ও বলল – "কিন্তু টাকা শিবাকে দিতেই হবে, আমি ছাড়ব না! আমি বলেছি ভালোভাবে না দিলে ওর এই এ্যাফেয়ারের ব্যাপার জার্নালিস্ট মহল থেকে ছড়িয়ে পড়বে রাজনৈতিক মহলে। আর ইলেকশনের আগে সেটা নিশ্চয়ই চাইবেনা ওর হবু শ্বশুর! তাতে একটু ভয় পেয়েছে। ইনফ্যাক্ট আমি কালকে কয়েকজন জার্নালিস্টের সঙ্গে মিট করছি যারা এই ইলেকশনে অপোজিশন্ পার্টিকে সাপোর্ট করছে। এখনই ঢাকা খুলছিনা, তবে ওয়ার্ম আপ করে রাখছি।" রূপসা একটু চিন্তিত হল। বলল – "বি কেয়ারফুল সুজাতা, পলিটিশিয়ানস্ আর ডেঞ্জেরাস্। আগুন নিয়ে খেলতে যাস্ না।" সুজাতা ঘাড়ে একটা ঝাঁকানি দিল – "দ্যাট ফেলো ডিডন্ট লিভ মি উইথ এনি আদার চয়েস্ – আই কেয়ার এ্যাবাউট মাই ডটার ইউ নো! আই নীড মানি টু গিভ শ্রেয়া দ্য এডুকেশন শী ওয়ান্টস্! শিবা ইজ ডিনাইং হার দ্যাট রাইট। হোয়াট ডাজ হি থিংক অফ হিমসেল্ফ? বড়লোক শ্বশুর আর গার্লফ্রেণ্ড পেয়ে আজ সব ভুলে গেছে। শিবা হ্যাড নাথিং ইন্ হিজ ফেবার হোয়েন্ উই স্টার্টেড ডেটিং। আমি প্রথম দিল্লীতে চাকরি পেলাম, তারপর আমরা বিয়ে করলাম। এ্যাণ্ড আই হেল্পড হিম্ গট এ জব ইন্ দ্য সেম্ কোম্পানি। তারপর ও এম্ বি এ করলো ... আমি তখন মেয়ে, সংসার আর চাকরি সামলাতে সামলাতে নাজেহাল। দেন হি গট এ বেটার জব এ্যাণ্ড স্টার্টেড এ্যাফেয়ার উইথ দিস গার্ল ... শ্বশুরকে ধরে চড়চড় করে ওপরে উঠবে। এ্যাণ্ড হিয়ার আই এ্যাম, স্টাক উইথ হিজ নেম্ ... হোয়াই??? ইফ এনিথিং, হি শ্যুড বি ক্যারিয়িং মাই নেম ... শিবা সুজাতা কৃষ্ণমূর্তি !"

বাঙালীদের মধ্যে যদিও এই প্রথাটা নেই – বিয়ের আগে বাবার এবং বিয়ের পরে স্বামীর নাম নিজের নামের মাঝখানে গুঁজে দেওয়া – তবু সুজাতার হতাশা এবং রাগকে বুঝতে কোনো অসুবিধে হলো না রূপসার। মাঝখানে না হোক, নামের শেষে তো সেই গুঁজতেই হচ্ছে স্বামীর নাম বাঙালী মেয়েদেরও।

তাছাড়া, নামই তো শুধু সব নয়। সন্তান এবং সংসারে আটকে যাওয়া স্ত্রীদের পেছনে ফেলে, স্বামীরা যখন অবলীলায় আরেকজনের হাত ধরে সামনে হাঁটা দ্যায় – তখন যে অপমানের আগুনে জ্বালিয়ে যায় তাদের এককালের সহচরীদের, সেই অপমানের জ্বালা কোনো ক্ষতিপূরণের টাকাতেই নেভে না। আর সেই ব্যাপারে বাঙালীরাও কিছু কম নয়!

সুজাতাকে নীচে ছেড়ে এসে, রূপসা বাইরের ঘরে বসলো। মা বাবা সুজাতাকে অনেকদিন ধরে চেনেন, দুঃখ পেলেন শুনে। মা বললেন – "আজকের সুজাতারা তা-ও চাকরিজীবি, আত্মবিশ্বাসে ভর করে তারা ক্ষতিপূরণ এবং বিবাহবিচ্ছেদ চায়। আগের প্রজন্মের স্ত্রীরা সেটুকুই বা পেরেছে কই? আর স্বামী যদি খ্যাতিমান প্রতাপশালী হন, তবে তো সাতখুন মাপ। পরিবারের সবাই মুখ তুলে তাকিয়ে থাকবেন সেই আকাশছোঁওয়া ব্যক্তিত্বের দিকে, হাত পেতে রাখবেন তাঁর দয়ার দান নিতে – আর সেই প্রহসনের ছায়ায় মাথা নীচু করে জীবন কাটিয়ে দেবেন তাঁর পরিত্যক্তা স্ত্রী। সেই স্ত্রী, যিনি না থাকলে স্বামীটির হয়তো আকাশ ছোঁওয়াই হতো না কোনদিন। তবু সেই স্ত্রীরা এমন জোর গলায় কোনদিন বলতে পারেননি – "ওনার নাম হওয়া উচিত ছিলো রূপম্ মৌরী চ্যাটার্জি !" ... "সব পুরস্কারের পাতায় নাম লেখা থাকা উচিত অপরেশ পার্বতী বসু" ... "ইতিহাস যেন লিখে রাখে সুরসম্রাটের পুরো নাম – সুনীল স্মৃতি চৌধুরী" ...!"

বাবা বললেন – "আসলে হাউই মাটি থেকে ওপরে ওঠার পর, অগ্নিশলাকাটিকে ছুঁড়ে ফেলা দেওয়া খুবই সহজ কাজ। ছুঁড়ে ফেলে দেওয়ার জন্য হাতেরও অভাব ছিলো না কোনদিন, আর সেই নতুন উচ্চতায় পৌঁছনো হাউইটিকে নিয়ে নতুন ঘর বাঁধার প্রলোভন দেখানো লাস্যেরও অভাব ছিলো না কোনদিন। তবে দোষটা আসলে সেই হাউইটিরই – কারণ সে-ই অবলীলাক্রমে মুছে ফেলতে চাইছে তার ইতিহাস, হাত লাগাচ্ছে অগ্নিশলাকাটিকে ছুঁড়ে ফেলতে। তোমার মা যা বললেন সেইসব তো আমার নিজের চোখেই দেখা।"

প্রথমজীবনে বামপন্থী আন্দোলনের সঙ্গীতশাখার সঙ্গে যুক্ত থাকার সূত্রে এবং পরবর্তীকালে কলকাতার এক নামকরা সংবাদপত্রের উচ্চপদে আসীন থাকার দৌলতে, অনেক প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ঝুলিতে ভরা রূপসার বাবার ভাণ্ডার। অনেকদিন পরে আজ রূপসা আবার সেই ছোটবেলার মতো উঁকি দিলো বাবার গল্পের ঝুলিতে। আর শুনতে শুনতে ছবি তুলে নিল মনের খাতায় – তার পরের লেখার থিম হবে "বধূ-পাঁচালী"।

"এক বধূ রাঁধেন বাড়েন, এক বধূ খান, এক বধূ রাগ করে বাপের বাড়ী যান" – অর্থাৎ কিনা বধূদের কাজকর্মের গণ্ডীর মধ্যে শুধু এইগুলোই পড়ে। পিতৃতান্ত্রিক সমাজের বর্ণনায় বধূর পরিভাষা এইরকমই সীমিত। কিছুদিন আগে পর্যন্তও নারী নিজেই তার যাবতীয় গুণ এবং সাংসারিক অবদান ভুলে, সেই পরিভাষার গণ্ডীতেই নিজেকে পরিমিত করে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে গেছে। ফল হয়েছে এই যে বধূরূপেণ সংস্থিতা শক্তিকে আটপৌরে করে সংসারের আঁচলে ঢেকে রাখতে রাখতে, আর সেই ছাইচাপা আগুনে প্রয়োজনের আলো জ্বেলে নিতে নিতে, পুরুষতন্ত্র নারীর অস্তিত্বটাকেই প্রায় বিস্মৃতির জায়গায় এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলো। দাবী যে করতেই জানে না, তার প্রাপ্যের হিসেব করবে কে ? দুর্ভাগ্য এই যে, সেটাই হচ্ছে গত প্রজন্মের বধূ-পাঁচালী – গল্প হলেও সত্যি।

এই পাঁচালীর প্রথম বধূ মৌরী চ্যাটার্জ্জী। স্বনামধন্য চলচ্চিত্র অভিনেতা রূপম চ্যাটার্জ্জীর স্ত্রী।

এই গল্পের দ্বিতীয় বধূ পার্বতী বসু। স্বনামধন্য কথাশিল্পী অপরেশ বসুর স্ত্রী।

এই গল্পের তৃতীয় বধূ স্মৃতি চৌধুরী। স্বনামধন্য সঙ্গীতকার সুনীল চৌধুরীর স্ত্রী। একজনের জন্ম কলকাতার ধনী এবং প্রতিপত্তিশালী পরিবারে। আরেকজনের জন্ম শহরতলীর নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারে। তৃতীয়জনের জন্ম গ্রামে। অমিল অনেক, আবার মিলও অসংখ্য। এঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন অশেষ গুণসম্পন্না, পতিব্রতা এবং সংসারগত প্রাণ।

কেউ করতেন অপূর্ব সেলাই এবং রান্না, কারুর গানের গলা হার মানাত নামজাদা সঙ্গীতশিল্পীদের, কারুর তুলির টানে কথা বলে উঠতো ছবিরা। অথচ সেসব কোন কাজেই এলো না – না হল অর্থকরী, না হল যশবাহী।

চিরকালের মতোই, সংসার নিভিয়ে দিলো নারীর প্রতিভা। শেখালো "পতির পুণ্যে সতীর পুণ্য"। শেখালো "মা" হওয়াই বিবাহিত নারীর জীবনের প্রধান কাজ আর "মা" হওয়া মানেই জীবনের সর্বসুখ ত্যাগ করা, সব ইচ্ছা বলি দেওয়া।

ভালবেসে এই নারীরা বরণ করে নিয়েছিলেন তাঁদের প্রাণের মানুষটিকে, যাঁরা সামাজিক প্রতিপত্তির চৌকাঠটুকু তখনও পার হয়ে উঠতে পারেননি। শুধু সেখানেই শেষ নয়, এঁরা পাশে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করে স্বামীদের সেই চৌকাঠটুকু পার হতে সাহায্য করেছিলেন – নিজেদের স্বপ্ন বা প্রতিভার দিকে ফিরেও তাকাননি, অর্থকষ্টে থেকেও অভিযোগ করেননি। এবং কালে দিনে তাঁদের স্বামীরা হয়ে উঠেছিলেন নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে একেকজন দিকপাল। কিন্তু তারপর ? ...

গত শতকের ষাটের দশক। তাঁদের স্বামীরা তখন সমাজের উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত – আপামর জনতা নীচে দাঁড়িয়ে তাঁদের জয়গান গাইছে। ভালবেসে বিয়ে করার পরও, এবং সন্তান জন্মের দশ-বারো-আঠারো বছর পরেও, তাঁদের স্বামীরা অবলীলাক্রমে "দ্বিতীয় নারী"র হাত ধরে স্ত্রীকে একদিন "দুয়োরাণী" করে দিলেন – খেলা শেষে ভাঙা পুতুল ছুঁড়ে ফেলে দেওয়ার মতো। ভাঙলেনও তাঁরা, ফেললেনও তাঁরা। বাধা দেওয়ার এবং তাঁদের স্ত্রীদের সমর্থনে কথা বলার সাহস বা ইচ্ছা কেউ দেখাল না – না ঘরের লোক, না বাইরের লোক। সেই দ্বিতীয় নারীদের কেউ ছিলেন সহকর্মী, কেউ ঘনিষ্ঠ আত্মীয়া, কেউ বা ছাত্রীস্থানীয়া। ক্ষতবিক্ষত অপমানিত স্ত্রীরা শুধু পড়ে রইলেন সমাজের শ্যেনদৃষ্টির সামনে। আইনমাফিক ক্ষতিপূরণ দিয়ে, বিবাহবিচ্ছেদ করে, সেই দিকপালরা স্ত্রীদের ভালবাসা ছাড়াও যে মর্যাদাটুকু প্রাপ্য সেটা দিতে পারতেন – তা কিন্তু তাঁরা দিলেন না, স্ত্রীদের বন্ধনমুক্তও করলেন না। যদিও হিন্দু বিবাহ আইন তখন বলবৎ। নতুন ও পুরোনো সংসারের মধ্যে আসা-যাওয়ার নিত্য ঘর্ষণে তাঁরা জাগিয়ে রাখলেন স্ত্রীদের মনের ক্ষত, বলা যায় পরোক্ষে একরকম বাধ্য করলেন স্ত্রীদের ভেঙে যাওয়া সংসারের দায়িত্ব বহন করে যেতে। গৃহপালিত জীবের মতো সেই পরিত্যক্তা স্ত্রীরা রয়ে গেলেন সংসারের খাঁচায়, দয়ার দানে কাটালেন জীবন – কারণ বিবাহিতা নারীর যে নিজের পেশা থাকতে নেই ! মানসিক এবং শারীরিক ধাক্কা সামলাতে সামলাতে সেই স্ত্রীদের দু'জন চলে গিয়েছিলেন অকালবিসর্জনে, আরেকজন কঠিন দূরত্বে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে বজায় রেখেছিলেন তাঁর শারীরিক ও মানসিক স্থিতি।

কেন এমনটা হতে পারলো – সে প্রশ্ন অবান্তর। হয়তো দৈনন্দিন সংসারের গ্ল্যামারহীন মলিনতাটুকু সহ্য করতে জানত না তাঁদের শিল্পী মন, হয়তো পড়ন্ত যৌবনে নন্দনকাননে খেলতে গিয়ে ভুলক্রমে আটকে গিয়েছিল স্খলিত চরণ, হয়তো বা পেশাগত সাফল্য ও আনুষঙ্গিক প্রতিপত্তির অহমিকা ঢেকে দিয়েছিল তাঁদের নীতিবোধ ... "হয়তো"র তালিকা অন্তহীন। কিন্তু আশ্চর্যের কথা এই যে সংসার থেকে সমাজ – কোথাও প্রশ্ন উঠল না। সবাই বিনাপ্রশ্নে মেনে নিলেন এই আচরণ। কোন "বৈপ্লবিক সাংবাদিক" সেই দিকপালদের ইন্টারভিউ নিতে গিয়ে ভুলেও প্রশ্ন করলেন না তাঁদের স্ত্রীদের সম্বন্ধে। কখনো বা সেই প্রথিতযশা ব্যক্তিদের জীবনী থেকেই মুছে দেওয়া হল একটা অধ্যায়।

তাই স্বামীরা স্বনামধন্য হলেও, এঁদের স্ত্রীরা প্রায় অপরিচিতাই রয়ে গেছেন সমাজের কাছে এবং সেইসব ভক্তকূলের কাছে যারা আগেই স্বনামধন্য ব্যক্তিত্বদের "সাতখুন মাপ" করে রেখে দিয়েছেন। অথচ আক্ষরিক অর্থে খুন না করলেও, এঁদের জীবনের কোথায় যেন রক্তের দাগ লেগে আছে বলে মনে হল রূপসার। রক্ত যেখানে ঝরার সেখানে ঝরেছে, সমাজ চোখ বন্ধ করে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে। হয়তো বা চর্চ্চায় মেতেছে কোনো প্রখ্যাত মহিলার বিবাহ-বিচ্ছেদ এবং তৎপরবর্তী "স্বৈরাচার" নিয়ে – কারণ, তিনি যে নারী! অগ্নিপরীক্ষা আর কাদা থাকে শুধু নারীর জন্যই, পুরুষ তো সদাই "সাদা" – সোনার আংটি আবার বাঁকা হয় নাকি !

গল্প শেষে নিজের ঘরে শুতে এসে রূপসা মনে মনে বলল – "তুই-ই ঠিক সুজাতা। তুই গত শতকের বৌ না, তুই এই শতকের বৌ। বৌ হওয়ার আগে, তুই এই শতকের শিক্ষিতা, স্বাধীন, চাকুরিজীবি মেয়ে – কারুর হাতের পুতুল

নয়। শিবার নাকে দড়ি দিয়ে ক্ষতিপূরণের টাকা নিয়ে তুই ঠিক করেছিস – বুঝিয়ে দিয়েছিস যে ছেলেদের যা খুশী করার দিন পার হয়ে গেছে। মেয়ের জন্ম দিয়েছে শিবা, তার দায়িত্ব নেই ? সব দায়িত্ব কি শুধু তোর ? মেয়েকে ইন্টারন্যাশনাল স্কুলে পড়ানোর টাকা শিবাকেই দিতে হবে, বড়লোক নতুন শ্বশুরের থেকে নিয়ে হলেও দিতে হবে ! ... মধু খাবে, দাম দেবেনা ?"

নিজের মনেই ভাবে রূপসা ... অযৌক্তিক অপমানের প্রতিবাদ করতে আজ শিখে গেছে আত্মনির্ভরশীল এই শতকের মেয়েরা। প্রতিবাদ করতে শিখিয়েছে তাদের শিক্ষা, তাদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা। পুতুলখেলার দিন শেষ। অনেক দামে পাওয়া এই স্বাধীনতা মেয়েরা ছাড়বে না, আর ঘরে-বাইরে দু'দিকে যুদ্ধ করে চলাও তাদের জন্য সম্ভব হবে না। তবে এই সমস্যার সমাধান কোথায়? এইভাবে আর কিছুদিন চললে মেয়েরা কি তবে সত্যিই আর বিয়ের রাস্তায় পা বাড়াবে না ? নাকি সুজাতার কথামতো, রিচার পথ ধরবে ? ... ভাবতে ভাবতে একসময় ঘুমিয়ে পড়লো রূপসা।

ঘুম ভাঙল মায়ের ডাকে। সুজাতার ফোন। এতো সকালে ? তাড়াতাড়ি এসে ফোন ধরল রূপসা – "কি রে, কি ব্যাপার ? সব ঠিকঠাক ?" এক মিনিটের নীরবতা। তারপর ভেসে এল সুজাতার ফিসফিসে গলা – "ইউ ওয়্যার রাইট ... আগুন নিয়ে খেলতে নেই।"

রূপসা ঠিক বুঝতে পারল না – "হোয়াট আর ইউ টকিং এ্যাবাউট ?" ভাঙা গলায় থেমে থেমে সুজাতা যা বলল সেটা হল এই যে, কাল রাতে ট্যাক্সি থেকে নেমে রাস্তা পেরিয়ে হোটেলে ঢোকার সময়ে ও একটুর জন্য গাড়ী চাপা পড়তে পড়তে বেঁচে গেছে। অথচ অত রাতে, ফাঁকা রাস্তায়, গাড়ীর চালকের তাকে দেখতে না পাওয়ার কথা নয়। উল্টোদিক থেকে আসা পথচারীটি তাকে হাত ধরে দ্রুত টেনে না নিলে, পিছন থেকে আসা গাড়ীটা তাকে পিষে দিয়ে চলে যেত। সবচেয়ে অবাক কাণ্ড যে গাড়ীটা দাঁড়াল না, ঝড়ের বেগে বেড়িয়ে গেল – সুজাতা নম্বরটা পর্যন্ত দেখতে পেল না। রূপসা বলল – "তোর কি মনে হচ্ছে কেউ ইচ্ছে করে ...?" কাঁপা কাঁপা গলায় সুজাতা বলল – "এ্যাবসল্যুটলি। ... আমি না থাকলে শ্রেয়ার কি হবে রূপসা ? শী ক্যান্ নট ইভনস্ট্যাণ্ড হার ফাদার, লেট এলোন লিভিং উইথ হিম !" সুজাতাকে এতো ভেঙে পড়তে কোনদিন দেখেনি রূপসা।

কবে নারীদের ভেঙেচুরে দেওয়ার অপরাধে দণ্ডভোগ করবে পুরুষ ? কবে জিতবে মেয়েরা এই অসম লড়াইয়ে ? ...

তিরিশ সেকেণ্ড লাগল রূপসার মনস্থির করতে।

তারপর রিসিভারটা কানে চেপে ধরে বলল – "লিসন্ টু মি নাউ ! তুই এখন ঘর থেকে একদম বেরোবি না। আই এ্যাম কামিং ইন হাফ এ্যান্ আওয়ার – গেট রেডি, প্যাক ইওয়োর স্টাফ। তুই আমার সঙ্গে চলে আসবি, এখানেই থাকবি একদিন, এখান থেকেই ফ্লাই ব্যাক করবি দিল্লী – কারুর সঙ্গে দেখা করতে হবে না তোকে আজ। হোয়াটএভার দ্যাট ইনসিডেন্ট ওয়াজ লাস্ট নাইট – এ্যাক্সিডেন্ট অর্ এ ডেলিবারেট এ্যাটেম্পট অন্ ইওর লাইফ – চান্স নেওয়ার দরকার নেই।" সুজাতার দুর্বল গলা ভেসে এল – "এর কোন দরকার নেই রূপসা ..."

রূপসা দৃঢ় গলায় বলল – "দরকার আছে। আরও বলছি শোন্, আজ তুই আমার সঙ্গে ব্রিটিশ কনস্যুলেটে গিয়ে ট্যুরিস্ট ভিসার এ্যাপ্লিকেশন করবি। আমার চেনা আছে ওখানে – তোর মেয়ের কথাও বলে রাখবো। দিল্লী ফিরে গিয়ে তুই ফর্মালি এ্যাপ্লাই করবি শ্রেয়ার জন্য – নিজে বাড়ী থেকে বেরোবি না, রিচাকে বলবি শ্রেয়াকে নিয়ে যেতে। চাকরি থেকে ইমিডিয়েটলি একমাসের ছুটি নিয়ে আমার কাছে চলে আসবি জানুয়ারির গোড়ায় – শিবা যেন জানতে না পারে। ভাল লাগলে থেকে যাবি – আমার আণ্ডারে একটা রিসার্চ পজিশন্ খালি আছে, আপাতত সেটা নিয়ে নে। পরে দেখা যাবে। শ্রেয়ার ভালই লাগবে, দেখিস। ওখান থেকে পরে নাহয় স্টেটস্-এ যাওয়ার কথা ভাববে ও – দু'জনে মিলে মানুষ করবো মেয়েটাকে।"

সুজাতার গলা ডুবে গেল চাপা কান্নায় – "রূপসা ..."

রূপসা হেসে বলল – "ইয়েস্ ডিয়ার, আই এ্যাম্ হিয়ার ফর্ ইউ সো নো মোর টিয়ারস্। রিচা আর বিয়াস্ না হয়েও আমরা একসঙ্গে থাকতে পারি – শুধু বন্ধু হয়েও সেটা সম্ভব। উই ক্যান্ লিভ লাইফ, সাপোর্ট ইচ আদার, এ্যাণ্ড গ্রো ওল্ড ট্যুগেদার। ইউ আর রাইট – উইমেন অফ দিস্ সেঞ্চুরি মাস্ট এ্যাণ্ড উইল লার্ন হাউ ট্যু সাপোর্ট ইচআদার। দে উইল নট ব্যাকস্ট্যাব ইচআদার এনি মোর। দে উইল বিকাম দ্য পিলার অফ স্ট্রেন্থ ফর ইচআদার। দিস্ ইজ এ নিউ এ্যরা উইথ নিউ পসিবিলিটিজ – উইমেন মাস্ট থিংক আউটসাইড দ্য বক্স। যতবার কোনো ছেলে কোনো মেয়েকে ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা করবে, ততবার অন্য মেয়েরা এগিয়ে আসবে সেই ভগ্নস্তূপকে নতুন করে গড়তে। দেখি কে জেতে শেষ পর্যন্ত !... এ্যাণ্ড ইউ নো হোয়াট – দিস্ উইল বি দ্য টপিক অফ মাই নেক্সট পেপার অন্ 'সোস্যাল চেঞ্জেস্ অফ দিস্ সেঞ্চুরি'!"

নূপুর রায়চৌধুরী

# অনিশ্চয়তার ঘেরাটোপে বিজ্ঞানপ্রবর

(ওয়ার্নার হাইজেনবার্গ / চিত্রঋণ: জার্মান ফেডারেল আর্কাইভস)

তখন সবে প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হয়েছি। বড় ক্লাসের দাদা দিদিরা এসেছে আমাদের সাথে পরিচয় করতে। আমরা প্রত্যেকেই কম বেশি চিন্তিত। কত সব কান্ড ঘটে শুনেছি! এক দিদি জিজ্ঞেস করল আমাকে, এই যে খুকি, তোমার কি করতে ভালো লাগে ? বললাম, গল্পের বই পড়তে। কি বই ? বললাম রবীন্দ্রনাথ, তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ, শরৎচন্দ্র, আশাপূর্ণা দেবী . . .। তা আমায় মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে সে বলল, নারায়ণ সান্যালের লেখা "বিশ্বাসঘাতক" পড়েছ ? ভয়ে ভয়ে মাথা নেড়ে, ঢোঁক গিলে বললাম, নাহ। সে বলল ধুস, তালে আর কি পড়লে ? মনে বিঁধে গেছিল কথাটা। বাড়িতে এসেই মাকে বললাম বইটার কথা। আমার মা ও ছিলেন আরেক বইয়ের পোকা। সুতরাং পরদিনই খোঁজ খোঁজ। কপালগুণে মায়েদের অনেকগুলো শাখা অফিসের একটার লাইব্রেরি-ক্যাটালগে ওই বইটার হদিস পাওয়া গেল। কিন্তু দেখা গেল বইটা অনেক দিন ধরেই আরেক গ্রাহকের জিম্মায় বন্দি হয়ে আছে। তেনাকে অনেক অনুরোধ উপরোধ করে বইটি শেষমেশ আমাদের হস্তগত হল।

হ্যাঁ, খাওয়াদাওয়া ভুলে শেষ করার মতো বই-ই বটে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়, ম্যানহাটন প্রকল্পের অধীনে আমেরিকার পারমাণবিক বোমা তৈরি সম্পর্কিত চাঞ্চল্যকর সব ঘটনার উপর ভিত্তি করে ১৯৭৪ সালে লেখা এই অনবদ্য উপন্যাসটি।

না, না আমি এখানে "বিশ্বাসঘাতক" নিয়ে আলোচনা করতে বসিনি। ওই কাহিনী তো আপনারা কম বেশি সকলেই জানেন। ভাবছেন কেন তবে ধান ভানতে শিবের গাজন ?

সত্যি কথা বলতে কি, ওই বইটা পড়ার পর থেকেই অ্যাটম বোমা তৈরির ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত বৈজ্ঞানিকদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অবদান ও ভূমিকা সম্পর্কে খবর সংগ্রহ করার পরিকল্পনাটা মাথায় ঘুরঘুর করত। এ কথা স্বীকার করতেই হবে: এই গোটা উদ্যোগটায় ইন্ধন জুগিয়েছিল "বিশ্বাসঘাতক"।

ম্যানহাটন প্রজেক্টের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ছিলেন যে সব বাঘা বাঘা বৈজ্ঞানিকেরা, তাদের মধ্যে প্রথমেই মনে আসে রবার্ট ওপেনহাইমার, এনরিকো ফার্মি, লিও জিলার্ড, ক্রফোর্ড গ্রিনওয়াল্ট, পার্সিভাল কিথ, ভ্যানেভার বুশ, জেমস বি কন্যান্ট এবং আর্নেস্ট ও লরেন্স-এর নাম। এর মধ্যে ওপেনহাইমারকে তো সবাই স্বীকৃতি দিয়েছেন "ফাদার অফ দা অ্যাটমিক বম্ব" নামে। ভাবছেন এ কি! মাত্র এ কটা নাম কেন? সবুর করুন মশাইরা! এই কয় বিজ্ঞানীরা, যাকে বলে হাতেকলমে কাজ করেছেন ম্যানহাটন প্রকল্পে; কিন্তু পারমাণবিক বোমা তৈরির বীজ বপন শুরু হয়েছিল তার অনেক আগে থাকতেই। প্রদীপ জ্বালানোর আগে সলতে পাকানোর মতোই নিলস বোর, আরউইন শ্রোডিঙ্গার, জেমস চ্যাডউইক, অটো হ্যান, লীজ মাইটনার, ফ্রিটজ স্ট্রাসম্যান এবং আরও অনেক অনেক দিকপাল বিজ্ঞানীদের গবেষণার অমূল্য ফলাফল এই সুকঠিন কাজের পথদিশারী।

এই ফাঁকে আসুন না, টুক করে অ্যাটম বোমা তৈরির কালানুক্রমিক ইতিহাসটা একটু ঝালিয়ে নিই আমরা ! অ্যাটম বোমা নিয়ে কথা হবে আর আর্নেস্ট রাদারফোর্ডের নাম আসবে না তা কী করে হয় ? তিনিই তো সর্বপ্রথম পরমাণুর নিউক্লিয়াস আবিষ্কার করেন সেই ১৯১১ সালে। এরপর ১৯১৩-তে ডেনিশ পদার্থবিদ নিলস বোর বললেন, ইলেকট্রনগুলি নিউক্লিয়াসের চারপাশে, নির্দিষ্ট আকারের পৃথক কক্ষপথে ভ্রমণ করে; কক্ষপথের আকারের উপরই নির্ভর করে ইলেক্ট্রনের শক্তি; এবং বাইরের কক্ষপথে ইলেকট্রনের সংখ্যাই যে কোনো পদার্থের বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করে। রাদারফোর্ডের অ্যাটমিক মডেলে ইলেক্ট্রনের স্থিতিশীলতার যে সমস্যা ছিল, বোরের নতুন মডেলে এবার তা সংশোধিত হয়ে যায়। বিশ্বজুড়ে তখন ঝড়ের গতিতে এগিয়ে চলেছে পারমাণবিক গবেষণার কাজ। অস্ট্রিয়ান পদার্থবিদ আরউইন শ্রোডিঙ্গার দেখালেন যে, ইলেকট্রন শুধু একটা কণা নয়, তরঙ্গের সব গুণাবলীও আছে এতে। ১৯২৬ সালে তিনি উপহার দিলেন এমন এক গাণিতিক সমীকরণ যা দিয়ে পরমাণুতে ইলেকট্রনের শক্তির মাত্রা নির্ভুলভাবে গণনা করা সম্ভব।

পদার্থবিদরা অনেক দিন ধরে জানতেন যে পরমাণুর বেশিরভাগ ভর তার কেন্দ্রীয় কোর নিউক্লিয়াসে অবস্থিত, যেখানে একছত্র সাম্রাজ্য চালাচ্ছে ধনাত্মক কণা প্রোটন। কিন্তু ১৯৩২ সালের মে মাস নাগাদ ব্রিটিশ বিজ্ঞানী চ্যাডউইক দেখালেন যে, কোরে আরেকটি নতুন কণাও রয়েছে, যার কোনো চার্জ নেই, তাই তার নাম দিলেন তিনি নিউট্রন। বিজ্ঞানীরা উপলব্ধি করলেন যে পদার্থের পারমাণবিক গঠন অনুসন্ধানের একটি নতুন উপায় হিসাবে নিউট্রনকে ব্যবহার করা যেতে পারে। যেই ভাবা সেই কাজ! দারুণ হুড়োহুড়ি পড়ে গেল গবেষকদের মধ্যে, কার ভাগ্যে জোটে পরবর্তী যুগান্তকারী আবিষ্কারের বিজয়মালা!

১৯৩৮-এর ডিসেম্বরে জার্মান রসায়নবিদ অটো হ্যান এবং ফ্রিটজ স্ট্রাসম্যান নিউট্রন দিয়ে চরম আঘাত করলেন ইউরেনিয়াম পরমাণুর নিউক্লিয়াসকে; বিদীর্ণ হয়ে গেল পরমাণুর বক্ষ; সেখান থেকে জন্ম নিল অনেক ছোট এবং হালকা এক পদার্থ; সেটিকে বেরিয়াম বলে সনাক্ত করেন হ্যান এবং স্ট্রাসম্যান। চমকে গেলেন ওঁরা! কী হলো ব্যাপারটা? সমস্যা সমাধানে এগিয়ে এলেন ডাকসাইটে অস্ট্রিয়ান পদার্থবিদ লিজ মাইটনার। তিনি এবং তাঁর ভাগ্নে রবার্ট ফ্রিশ পারমাণবিক বিভাজনের সঠিক ব্যাখ্যা করলেন এবং এর বিস্ফোরক সম্ভাবনারও পূর্বাভাস দিলেন। ১৯৩৯ সালের জানুয়ারী – হ্যান-স্ট্রাসম্যানের পারমাণবিক বিভাজন আবিষ্কারের বিষয়টি এবার পরীক্ষামূলকভাবে নিশ্চিত করলেন ফ্রিশ। পরমাণুর এই বিদারণ বা "নিউক্লিয়ার ফিশন" বিজ্ঞানীদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিল, পরমাণু অবিভাজ্য নয়। এতকাল পদার্থবিদরা যে পারমাণবিক চেইন-রিঅ্যাকশনের সম্ভাব্যতা জল্পনা কল্পনা করছিলেন তা এক্কেবারে হাতেনাতে প্রমাণিত হয়ে গেল। পরীক্ষার এই চাঞ্চল্যকর ফলাফল নিলস বোরকে জানাতে ফ্রিশ পৌঁছে যান কোপেনহেগেনে, অতঃপর বোর তাঁর আমেরিকান সহকর্মীদের কাছে আবিষ্কারটি রিপোর্ট করেন। বোর এবং জন আর্চিবল্ড হুইলার ১৯৩৯-এর শেষের দিকে প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটিতে চেইন-রিঅ্যাকশন পরীক্ষার মাধ্যমে নির্ধারণ করেন যে ইউরেনিয়াম-২৩৫ পারমাণবিক বিস্ফোরণ তৈরি করতে পারে। বৈজ্ঞানিকদের এই চরম সাফল্যের সাথে সাথে সেদিনই বুঝি ধ্বংসের এক মারণ-বীজ রোপিত হয়ে গেল বসুন্ধরার গোপন গভীর কন্দরে!

সুধীগণ এই বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সময়টা একটিবার খেয়াল করে দেখুন – ১৯৩৯ সাল – ইতিহাসের পাতায় মসীলিপ্ত এক দুঃসময়! ওই বছরেরই পয়লা সেপ্টেম্বর অত্যাচারী অ্যাডলফ হিটলারের হুকুমে নাৎসি জার্মানি পোল্যান্ড আক্রমণ করে; পোল্যান্ডে আটকে পড়ে থাকা জাতভাই ইউক্রেনিয়ান আর বাইলোরাশিয়ানদের সহায়তায় সোভিয়েত ইউনিয়নও ঝাঁপিয়ে পড়ে – বেজে ওঠে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দামামা। পৃথিবী ভাগ হয়ে যায় অক্ষ শক্তি (জার্মানি, ইতালি এবং জাপান) এবং মিত্র পক্ষে (ফ্রান্স, গ্রেট ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং কিছুটা হলেও চীন)।

স্বাভাবিক ভাবেই আরেকটা কথা-ও মাথায় আসে – পারমাণবিক গবেষণার বিষয়ে নাজি জার্মানি কী করছিল এই সময়? না, তারাও বসে ছিল না! ১৯৩৯ সালের এপ্রিল – হ্যান-স্ট্রাসম্যানের অসাবধানতাবশত নিউক্লিয়ার ফিশন

আবিষ্কারের কয়েক মাস পরেই, "ইউরানভেরিন" বা "ইউরেনিয়াম ক্লাব" নামে জার্মানি শুরু করে দিয়েছিল তাদের পারমাণবিক শক্তি প্রকল্পের গোপন কর্মসূচি। কিন্তু এই প্রকল্পের অগ্রগতির ইতিহাস সম্বন্ধে রয়েছে অজস্র জল্পনা-কল্পনা, জটিল সব প্রশ্ন, আর অনেক না-মেলা উত্তর । তবে মোদ্দা কথাটি হলো, নাজিরা বোমা তৈরিতে অসফল হয়েছিল ।

এসব তথ্য নাড়াঘাঁটা করতে করতেই জানলাম যে, নোবেল লরিয়েট জার্মান তাত্ত্বিক পদার্থবিদ ওয়ার্নার হাইজেনবার্গকে ঘিরে থেকে থেকেই নানা সমালোচনার ঢেউ উঠেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় হাইজেনবার্গের ভূমিকা নিয়ে সেই যে বিতর্ক শুরু হয়েছিল, তাঁর জন্মের ১০০ বছরের বেশি সময় পরেও তা অব্যাহত। কি আশ্চর্য! পুরো ব্যাপারটায় একটা জোর নাড়া খেলাম যেন!

এ কথা অস্বীকার করার কোনো অবকাশ নেই যে, বিংশ শতকের প্রথম দিকে পদার্থবিজ্ঞানের রমরমার যে কোনও বিবরণ খতিয়ে দেখতে গেলেই নিশ্চিতভাবেই জার্মানির নাম এসে পড়ে। হবে নাই বা কেন? সেই সময় জার্মানিতে ছিলেন পারমাণবিক এবং কোয়ান্টাম পদার্থবিজ্ঞানের উন্নয়নের পথপ্রদর্শক, তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানী আর্নল্ড সমারফেল্ড। আজিমুথাল কোয়ান্টাম সংখ্যা এবং স্পিন কোয়ান্টাম সংখ্যা প্রবর্তনের জন্য যত না তিনি পরিচিত, তার চেয়ে ঢের বিখ্যাত ছিলেন অসামান্য ছাত্রদের একটি গোটা প্রজন্মের শিক্ষক হিসাবে। কি বিশ্বাস হচ্ছেনা কথাটা? শুনুন তবে!

সমারফেল্ডের চারজন ডক্টরেট ছাত্র: ওয়ার্নার হাইজেনবার্গ, উলফগ্যাং পাওলি, পিটার ডেবাই এবং হ্যান্স বেথে নোবেল পুরস্কার জিতেছিলেন। এঁরা ছাড়াও ছিলেন অগুণতি বাঘা বাঘা সব ছাত্র যাঁরা পদার্থবিদ্যার অলিতে গলিতে রীতিমতো দাপিয়ে বেরিয়েছেন জগৎ জুড়ে।

এ হেন প্রবাদপুরুষ সমারফেল্ডের তত্ত্বাবধানে, ১৯২২ সালের গ্রীষ্মে, তরুণ হাইজেনবার্গ ডক্টরেট করতে আসার পরপরই, সমারফেল্ড তাঁর প্রাক্তন ছাত্র পল এপস্টেইন-যিনি না কি তখন ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজির তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক হয়েছেন, তাঁকে লিখেছিলেন: "হাইজেনবার্গ সম্বন্ধে আমি দারুণ আশা রাখি, আমি মনে করি, ডেবাই এবং পাওলি সহ আমার সমস্ত ছাত্রদের মধ্যে সেই সবচেয়ে প্রতিভাধর" । গুরুর এই ভবিষ্যৎবাণীর মাত্র ১০ বছর পরই, ১৯৩২ সালে, পদার্থবিদ্যার "কোয়ান্টাম মেকানিক্সে" নোবেল পুরস্কার জিতে নেন হাইজেনবার্গ।

কি, আর কিছু বলার আছে আপনাদের ?

পদার্থবিজ্ঞান সাধনার জয়যাত্রার ইতিহাসে হাইজেনবার্গের অবদান সুবিশাল। কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যাকে গাণিতিক আকারে প্রকাশ করার জন্য ১৯২৫ সালে হাইজেনবার্গ এক যুগান্তকারী পদ্ধতি প্রয়োগ করেন, যাকে বলা হয় "ম্যাট্রিক্স মেকানিক্স"। পারমাণবিক পদার্থবিদ্যা যেন এতে পুরো ঘুরে দাঁড়াল। এর কোয়ান্টাম জাম্পের বিবরণ বোর মডেলের ইলেক্ট্রন কক্ষপথকে প্রতিস্থাপন করে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়: ওই ক্ষেত্রে কাজ করছিলেন যে সব পদার্থবিদ তাঁদের অনেকেই এই মতবাদ পছন্দ করেননি, কারণ তুলনা করার জন্য কোনো ফিজিক্যাল মডেল সেখানে ছিল না। এরপর, ১৯২৭ সালে হাইজেনবার্গ আনসার্টেনটি প্রিন্সিপল "বা অনিশ্চয়তা নীতি" প্রস্তাব করেন, যেখানে বলা হয় যে একটা কণার অবস্থান এবং ভরবেগ-এই দুটোকে একই সাথে কখনোই পরম নির্ভুলতার সাথে মাপা যায় না, এমনকি তত্ত্বেও নয়। এই মানগুলির একটাকে আমরা যত বেশি সঠিকভাবে জানব, অন্যটিকে ততই কম সঠিকভাবে জানা যাবে। অনিশ্চয়তার নীতিটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি পদার্থবিদদের বুঝতে সাহায্য করে যে সাব-অ্যাটমিক স্তরে কণারা কীভাবে একে অপরের সাথে সংযোগ স্থাপন করে। একাধারে তরঙ্গ, আর অন্যদিকে কণা-পদার্থের এই দুই ভিন্নধর্মী সত্ত্বার উপর ভিত্তি করে এই নীতিটি নির্ধারিত হয়েছে – যা কোয়ান্টাম মেকানিক্সের মূল উপজীব্য। এখানে উল্লেখ করা যেতেই পারে যে, আইনস্টাইন কিন্তু কখনোই হাইজেনবার্গের এই "আনসার্টেনটি প্রিন্সিপল"-কে একটি মৌলিক ভৌত নীতি হিসেবে গ্রহণ করেননি।

এসব দেখেশুনে এটা বুঝতে মোটেই কষ্ট হয়না যে, হাইজেনবার্গ একজন খুব উঁচু মাপের পদার্থবিদ ছিলেন। তাহলে, ওঁকে নিয়ে কার, কী সমস্যা হয়েছিল? অনেকের মতো আমাকেও এই প্রশ্ন থেকে থেকেই উতলা করেছে। নানা কাজের ভিতরও, সময় সুযোগ পেলেই এই বিষয়ে বইপত্র নাড়াচাড়া করতাম। একসময় ব্যাপারটা পুরোপুরি নেশার পর্যায়েই এসে দাঁড়াল। নয় নয় করে এ বিষয়ে সংগ্রহও হয়েছে বেশ খানিক খবর। তা অনেকদিন ধরেই ইচ্ছে করছিল, এগুলো আপনাদের সাথে ভাগ করে নেব। কে জানে আলাপ আলোচনা থেকে আরও কত অজানা তথ্য মিলে যাবে!

এ ব্যাপারে নথিপত্রের অনুসন্ধান করতে গিয়েই বুঝেছিলাম, যে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে একজন বৈজ্ঞানিকের কর্মকান্ডের প্রকাশ, বিকাশ ও বিস্তার ঘটে, সেই বিশেষ সময়ের কথা উঠবে না – তা কী করে হয়? আসলে কানে টান পড়লে মাথা আর কবে স্থির থাকতে পারে? আমাদের জীবনের প্রতিটি টানাপোড়েন, উত্থানপতনের সাথে সময়ের একটা নিবিড় যোগ থেকেই যায় – তাই না?

সুতরাং, হাইজেনবার্গকে ঘিরে উদ্বেলিত বিতর্কের উৎস খুঁজতে গেলে আমাদের ফিরে যেতে হবে ইতিহাসের সেই অত্যন্ত টালমাটাল সময়ে। এক ঝলক দেখে নিতে হবে কেমন ছিল তখনকার বিশ্ব রাজনীতির খেলাঘর। পোল্যান্ড আক্রমণের পরপরই রীতিমতো জোর কদমে শুরু হয়ে গিয়েছিল জার্মানির "ইউরেনিয়াম প্রকল্প"। জার্মান আর্মি অর্ডন্যান্স আর্মি-পদার্থবিদ কার্ট ডিবনারের নেতৃত্বে নিউক্লিয়ার ফিশনকে যুদ্ধের কাজে কীভাবে প্রয়োগ করা যায় সেই বিষয়ে তদন্তের জন্য একটা গবেষণা কার্যক্রম প্রতিষ্ঠা করে। ১৯৪২ সালের জুনে, ইউরেনিয়াম প্রকল্পটি গবেষণা পরিষদের দায়িত্বে ফিরে আসে এবং হাইজেনবার্গকে কায়সার উইলহেলম ইনস্টিটিউট ফর ফিজিক্সের পরিচালক হিসাবে দায়িত্ব প্রদান করা হয়। সমস্ত পৃথিবী ভয়ে, আশঙ্কায় কুঁকড়ে ছিল – নাজিরা হয়ত সবার আগে পারমাণবিক বোমা আয়ত্ত্ব করে ফেলবে আর নরমেধ যজ্ঞের সবথেকে শক্তিশালী হাতিয়ারটি ব্যবহার করে তারা বিশ্বজয় করবে।

জানেন, আপনাদের মতো আমিও না মাঝে মাঝেই ভাবি, ওই মারণাস্ত্র নাজিরা প্রথম তৈরি করতে সক্ষম হলে, আজকের এই পৃথিবী কতটা আলাদা হতো ? কি ব্যাপারটা কল্পনা করতেই শিউরে উঠলেন তো ? হ্যাঁ, আমরা সকলেই !

কিন্তু না; জার্মানি, ইতালি, জাপান ওরা কেউ সেদিন সফল হয়নি এই কাজে। বিজয়লক্ষ্মীর বরণডালা তোলা ছিল আমেরিকারই জন্য। অক্ষশক্তির কেউ যা পারেনি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তা করে দেখিয়েছিল।

এমন একটা দুরূহ কাজ – কোথায় কখন তার শুরু? ইতিহাস বলে যে, ১৯৩৯ সালের ২ আগস্ট, মার্কিন রাষ্ট্রপতি ফ্র্যাঙ্কলিন ডেলানো রুজভেল্টকে লেখা জগৎবিখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইনের একটি চিঠিই ম্যানহাটন প্রজেক্টের জন্মের উৎস। হাঙ্গেরিয়ান বিজ্ঞানী লিও জিলার্ডের প্রচুর পীড়াপীড়িতে আইনস্টাইন এই চিঠি লেখেন; চিঠির খসড়া তৈরি করতে জিলার্ড অবশ্য অনেক সাহায্য করেন। কী ছিল সেই আইনস্টাইন-জিলার্ড চিঠিতে? জার্মানি যে পারমাণবিক বোমা তৈরি করতে পারে, সেই সম্ভাবনারই উত্থাপনা ছিল চিঠিটির প্রথম পৃষ্ঠায়। ১৯৩৯-এর অক্টবরে চিঠিটি প্রেসিডেন্টের গোচরে আসে, ব্যস, আর যায় কোথায়? নাজিদের সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার জন্য, রুজভেল্ট তৎক্ষণাৎ ইউরেনিয়াম সংক্রান্ত উপদেষ্টা কমিটি গঠনের অনুমতি দেন; ন্যাশনাল ব্যুরো অফ স্ট্যান্ডার্ডের ডিরেক্টর লিম্যান জে ব্রিগসকে সেই কমিটির প্রধান নিযুক্ত করেন। ২১-এ অক্টবরেই তড়িঘড়ি কমিটির প্রথম সভা বসে, এবং এই নিউট্রন পরীক্ষা পরিচালনার জন্য ছয় হাজার ডলারের বাজেট অনূদিত হয়।

১৯৪১- এর ৭-ই ডিসেম্বর জাপানিরা পার্ল হারবার আক্রমণ করতেই আমেরিকা ও গ্রেট ব্রিটেন জাপানের বিরুদ্ধে পরদিনই আনুষ্ঠানিকভাবে যুদ্ধ ঘোষণা করে। এরপর ডিসেম্বর ১১-তে জার্মানি এবং ইতালি আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলে আমেরিকা তাদের সাথেও যুদ্ধে লিপ্ত হয়। এবার আর ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণে থেমে থাকা নয় ১৯৪২-এর ১৯-এ জানুয়ারী রুজভেল্ট আনুষ্ঠানিকভাবে পারমাণবিক বোমা প্রকল্পের অনুমোদন দেন। সেই মতো, ১৯৪২, ১৩ আগস্ট: ইউনাইটেড স্টেটস আর্মি কর্পস অফ ইঞ্জিনিয়ার্সের প্রধান মেজর জেনারেল ইউজিন রেবোল্ড ম্যানহাটন

ইঞ্জিনিয়ারিং ডিস্ট্রিক্ট গঠন করেন, জেমস সি. মার্শাল হন ডিস্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার। নিউয়র্কের ম্যানহাটন শহরের ২৭০ ব্রডওয়েতে একটি অফিস বিল্ডিংয়ের ১৮ তলায় কর্নেল মার্শাল পারমাণবিক বোমা তৈরির এই গোপন প্রকল্পটি শুরু করেন। প্রকল্পের কোড নাম দেওয়া হয় "ম্যানহাটন প্রজেক্ট"।

ভাবছেন বোমা তৈরি হল লোস আলামোসে আর নাম হল ম্যানহাটনের, এ কেমন কথা? আসলে আর্মি কর্পসের ইঞ্জিনিয়াররা ওখানে থেকেই কাজ করছিল। ওদিকে পদার্থবিদ্যার নামি দামি গবেষণাগারগুলোও নিউইয়র্ক-এই ছড়ানো ছিটানো ছিল। পারমাণবিক অস্ত্র তৈরির জন্য মধ্য আফ্রিকার বেলজিয়ান কঙ্গো থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যে ইউরেনিয়াম আকর আসত, প্রথমদিকে তার বেশিরভাগ নিউয়র্কের ম্যানহাটন শহরের গুদাম বা ডকগুলোতেই মজুদ থাকত। কিন্তু সেনাবাহিনী শীঘ্রই সিদ্ধান্ত নেয় যে নিউইয়র্ক একে জনাকীর্ণ তায় উপকূলের খুব কাছাকাছি-এতে গোপনীয়তা রক্ষা করা কঠিন। তাই এই প্রকল্প ১৯৪৩ সালের পয়লা এপ্রিল স্থানান্তরিত হয় নিউ মেক্সিকোর নির্জন লোস আলামোসে। ম্যানহাটন অফিস বন্ধ হয়ে গেলেও, প্রকল্পের নামটা একই থেকে গেছে।

একটা প্রশ্ন কিন্তু আমাদের মাথার মধ্যে এই মুহূর্তে গজগজ করছে এবং সেটা এড়িয়ে যাওয়ার কোনো উপায় নেই। মাত্র ২৭ মাসে ম্যানহাটন প্রজেক্টের মাধ্যমে আমেরিকা তৈরি করল মারণবোমা। এত অল্প সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কীভাবে অর্জন করল এই অসাধারণ কৃতিত্ব?

সে অনেক কারণ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মুখে এবং যুদ্ধ চলাকালীন অন্ধকার সময়ে নাজিদের কবল থেকে একশোরও বেশি যেসব প্রথিতযশা ইউরোপিয়ান বিজ্ঞানীরা শরণার্থী হয়ে পালিয়ে এসেছিলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, তাঁদের জন্য হাট করে দরজা খুলে দিয়েছিল আমেরিকা।

এঁদের নাম শুনলেই মাথা আপনি নুইয়ে আসে অসীম বিস্ময় মাখা শ্রদ্ধায়। কাকে ফেলে কাকে দেখি ? যেন চাঁদের হাট বসেছিল তখন লোস আলামোসে!

আমি আর বেশি কীই বা বলব? শুনুন না, হাঙ্গেরির বুদাপেস্টে থেকে আসা চার উজ্জ্বল বিজ্ঞানী এডওয়ার্ড টেলার, ইউজিন উইগনার, জন ভন নিউম্যান এবং লিও জিলার্ড সম্বন্ধে আরেক অসাধারণ প্রতিভাধর ইতালির উদ্বাস্তু, পদার্থবিদ এনরিকো ফার্মি রঙ্গরস করে কি বলছেন: "মঙ্গল থেকে একটি মহাকাশযান নিশ্চয়ই বুদাপেস্টে নেমে এসেছিল আর তারাই এই চারজনকে মর্ত্যধামে ফেলে দিয়ে গেছে"। ব্যস, সেই থেকে বিজ্ঞানীমহলে এনাদের ডাকনাম চালু হয়ে গেল "মার্টিয়ানস"। হাঙ্গেরির মতো পুঁচকে একটা দেশ থেকে এসে, নিজেদের স্থানীয় ভাষায় যদি কেউ কথা বলে – যা অন্য সকলের কাছে অবোধ্য, তার উপর বুদ্ধিতে তাঁরা অতিমানবীয়, আপনারাই বলুন: এছাড়া আর কোন নাম তাঁদের জন্য উপযুক্ত হতে পারত? মহাবিজ্ঞানী হলে কি হয়-মারাত্মক রসবোধ ছিল বটে এনাদের!

বিশ্বের বাঘা বাঘা পদার্থবিদ, গণিতবিদ এবং প্রকৌশলীদের নাম যশ ক্ষমতার লোভ দেখিয়ে এই প্রকল্পের অংশীদার করেছিল আমেরিকা। আর এ কাজ তো যেমন তেমন নয় – যেন রাজসূয় যজ্ঞ – প্রকল্পের বিভিন্ন দিক নিয়ে কাজ করছেন ২৫০,০০০ জন মানুষ। অর্থের পরিমাণও কিছু কম ছিল না; দুই বিলিয়নের বেশি মার্কিন ডলার খরচ হয়েছে। বেশ কিছু লোক তো লাভজনক মজুরি পাওয়ার আশাতেই এই প্রকল্পে যোগ দিয়েছিল। এই ধরুন, হ্যানফোর্ড থেকে আসা রিঅ্যাক্টর অপারেটর জেরি সসিয়ার পরিষ্কার কথা: "এখানে মজুরি গড় কাজের চেয়ে ঢের ভালো ছিল"'।

দাঁড়ান দাঁড়ান, কোথা থেকে কোথায় চলে যাচ্ছে গল্পের সুতো! আসুন, আবার মনোনিবেশ করি হাইজেনবার্গের বিষয়ে।

তৃতীয় রাইখের সময় এবং বিশেষ করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় হাইজেনবার্গের কার্যকলাপের মূল্যায়ন করতে গেলে দেখা যায়: হাইজেনবার্গের বিজ্ঞান সাধনা এবং তাঁর জীবন, এ দুই-ই যেন সমান্তরালভাবেই অগ্রসর হয়েছিল-এক বিশেষ কঠিন এবং বিতর্কিত পথ ধরে।

যুদ্ধ শেষের পর থেকে, হাইজেনবার্গ এবং তাঁর আচরণ নিয়ে বিভিন্ন লোক তাদের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ করেছে; রীতিমতো জোর দিয়ে, নিজস্ব আবেগ মিশিয়ে, তারা সেই সব মতামত ব্যক্ত করেছে। কারও কারও জন্য সেই যুদ্ধ এবং তৎকালীন শাসনের অবিভাজ্য ভয়াবহতা দ্বারা উদ্ভূত তীব্র আবেগ হাইজেনবার্গের জীবন এবং কর্মের অনেক অস্পষ্টতা, দ্বৈততা এবং আপসের সাথে মিলিত হয়ে স্বয়ং হাইজেনবার্গকেই এক ধরনের অনিশ্চয়তার নীতির অধীন করে তুলেছে।

কিছু ইতিহাসবিদ হাইজেনবার্গকে একজন নায়ক হিসেবে দেখেন, যিনি না কি জার্মান পারমাণবিক কর্মসূচিকে লাইনচ্যুত করার জন্য কৌশল ব্যবহার করেছিলেন। অন্যরা মনে করেন যে সরকার সম্পর্কে বিরোধপূর্ণ অনুভূতি থাকলেও আদতে হাইজেনবার্গ একজন দেশপ্রেমিক জার্মানই ছিলেন।

হিটলারের অধীনে জার্মান বুদ্ধিজীবীদের কতটা দুর্দশা এবং যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে দিনযাপন করতে হয়েছিল তা হাইজেনবার্গের চেয়ে ভালো আর কে জানেন? ম্যানহাটন প্রজেক্টের সাথে পাল্লা দেওয়ার জন্য তাঁর উপরই তো ন্যস্ত হয়েছিল নাজি পারমাণবিক বোমা তৈরির গুরুদায়িত্ব। সে কাজে কিন্তু সফলতা আসেনি। সবার মনে একই প্রশ্ন: হাইজেনবার্গের মতো বাঘা বিজ্ঞানী থাকতে, নাজিরা অসফল হয় কী করে? পারমাণবিক বোমা তৈরিতে জার্মানদের এই ব্যর্থতা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং বিতর্কিত দিকগুলির মধ্যে একটি। হাইজেনবার্গের ভূমিকা নিয়ে পন্ডিতমহলে যুক্তিতক্কের চালাচালি আজও অব্যাহত।

প্রথমেই আসি ১৯৫৬ সালে লেখা অস্ট্রিয়ান সাংবাদিক রবার্ট জাংক-এর "ব্রাইটার দ্যান এ থাউসেন্ড সানস" বইটির কথায়। ম্যানহাটন প্রকল্প এবং জার্মান পারমাণবিক বোমা প্রকল্পের প্রথম প্রকাশিত বিবরণ পাওয়া যায় এই বইয়ে। জাংক বিশ্বাস করতেন যে হাইজেনবার্গ পারমাণবিক বোমা তৈরি করার জন্য কঠোর চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু পদার্থবিদ্যা সঠিকভাবে বুঝতে না পারার কারণে তিনি ব্যর্থ হন।

এরপর ১৯৯৩ সালে প্রকাশিত টমাস পাওয়ার্সের লেখা "হাইজেনবার্গ'স ওয়ার: দা সিক্রেট হিস্ট্রি অফ দা জার্মান বম্ব" বইটিতেও হাইজেনবার্গকে একজন চ্যাম্পিয়ন হিসেবেই বর্ণনা করা হয়েছে যিনি ইচ্ছাকৃতভাবে জার্মান পারমাণবিক প্রকল্পের অগ্রগতি বিলম্বিত করেছেন। পাওয়ার্সের মতে যুদ্ধের পর পরস্পরবিরোধী দারুণ চাপের মধ্যে ছিলেন হাইজেনবার্গ, তিনি যে কী করার চেষ্টা করছেন, তা ব্যাখ্যা করা তার পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে। তিনি নিজেকে নাজিদের থেকে দূরে রাখতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তিনি এটা মোটেই চাননি যে লোকে তাকে বিশ্বাসঘাতক মনে করুক। তিনি তাঁর সহকর্মী জার্মানদের কাছে এটা দাবি করতে অনিচ্ছুক ছিলেন যে তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে তাঁদের এই যুদ্ধে হেরেছেন, কিন্তু তিনি তাদের এটা ভাবতে দিতে আরও কম অনিচ্ছুক ছিলেন যে, কেবল মাত্র অক্ষমতার কারণেই তিনি এই ব্যর্থতা ডেকে এনেছেন। পাওয়ার্সের যুক্তিগুলো ভীষণভাবে ইঙ্গিত করে যে, হাইজেনবার্গ নিজেই নাজি বোমা বানানোর প্রকল্পটি নষ্ট করেছেন।

পাওয়ার্স মনে করেন, হাইজেনবার্গ বোরকে ইঙ্গিত দিতে চেয়েছিলেন যে জার্মানি বোমা তৈরি করবে না বা করতে পারবে না। হাইজেনবার্গ খুব আশা করেছিলেন যে বোর যদি আমেরিকানদের এই সত্যতা বুঝিয়ে বলতে পারে, তবে তারাও সম্ভবত এই অবিশ্বাস্য রকমের ব্যয়বহুল বোমা প্রকল্প বন্ধ করে দেবে। বোরের সাথে ১৯৪১ সালে পুনর্মিলনের এটাই ছিল হাইজেনবার্গের আসল উদ্দেশ্য। উদ্দেশ্য যাই হোক না কেন, বোর-হাইজেনবার্গের মিটিং ব্যর্থ হয়, কারণ কথাবার্তার মাঝেই হাইজেনবার্গের উপর রেগেমেগে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন বোর। মজার ব্যাপার হলো, এই মিটিং কিন্তু আমেরিকানদের কাছে এটা নিশ্চিত করতে সফল হয়েছিল যে, জার্মানি পারমাণবিক বোমা নিয়ে গবেষণায় জড়িত ছিল এবং যুদ্ধের পরে, হাইজেনবার্গের সেই প্রচেষ্টা নিয়ে বিতর্কের জাল ছড়াতেও এটা কৃতকার্য হয়েছিল।

এসবের মধ্যেই হঠাৎ ১৯৯৮ সালে প্রকাশিত, ইতিহাসবিদ পল লরেন্স রোজের লেখা "হাইজেনবার্গ এন্ড দা নাজি অ্যাটমিক বম্ব প্রজেক্ট, ১৯৩৯-১৯৪৫" মনোগ্রাফটা আমাদেরকে একটা ধন্দের মধ্যে ফেলে দেয়। এই লেখায়

হাইজেনবার্গের চরিত্র সম্পর্কে গভীর সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে। লেখাটা পড়ে মনে হয় হাইজেনবার্গ অতিমাত্রায় আবেগপ্রবণ এবং প্রচন্ড উচ্চাকাঙ্খী একজন মানুষ ছিলেন। বইটিতে একথাও বলা হয়েছে যে "জার্মান-বিরোধী মানসিকতা থেকে হাইজেনবার্গ মোটেই বেরিয়ে আসতে পারেননি"। এখানেই শেষ নয়। বৈজ্ঞানিকভাবে ভুল ধারণার জন্যও হাইজেনবার্গকে দায়ী করা হয়েছে। রোজের মতে, নাজি পারমাণবিক বোমা প্রকল্পে হাইজেনবার্গ সফল হননি, তার কারণ: তাঁর খারাপ পদার্থবিদ্যা এবং খারাপ নৈতিকতা; পরবর্তী কালে ওই যে কথাটা চালু হয়েছিল যে তিনি ইচ্ছা করে প্রকল্প নষ্ট করেছিলেন – ওসব সাজানো গল্প ছাড়া আর কিছুই নয়!

অদ্ভুত ব্যাপার – জাংক এবং পাওয়ার্সের থেকে রোজের মতামত এক্কেবারে উল্টো। যেন চাঁদের এপিঠ আর ওপিঠ।

স্বাভাবিক ভাবে প্রশ্ন এসেই যায় – জার্মান বোমা কর্মসূচির ব্যর্থতায় হাইজেনবার্গের সত্যি ভূমিকাটা কী ছিল? কে বলে দেবে? একজনই তো পারতেন – হাইজেনবার্গ স্বয়ং। কিন্তু এই ব্যাপারে কথা উঠলেই হাইজেনবার্গ বার বার শুধু একটা কথাই বলেছেন যে, "আমি এবং 'ইউরেনিয়াম ক্লাবের' সহকর্মী বিজ্ঞানীরা এই সিদ্ধান্ত থেকে বেঁচে গিয়েছিলাম কারণ যুদ্ধের পরিস্থিতির কারণে আমরা যথেষ্ট অগ্রগতি করতে পারিনি"। এইরকম ভাসা ভাসা উত্তরে, গোটা বিষয়ে অনিশ্চয়তা বেড়েছে বৈ একটুও কমেনি!

সুতরাং আবার খোঁজ খোঁজ।

এবার পেয়ে গেলাম আরেক লেখকের সন্ধান। তিনি হলেন মার্ক ওয়াকার-নিউইয়র্কের শেনেকট্যাডিতে ইউনিয়ন কলেজের ইতিহাসের "জন বিগেলো" অধ্যাপক। বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এবং জাতীয় সমাজতন্ত্রের ইতিহাস নিয়ে লেখালেখিতে তিনি যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছেন।

ওয়াকার মনে করেন এরকম জটিল প্রশ্নের কোনো একটা সম্পূর্ণ সাদা বা কালো সহজ উত্তর হতে পারেনা। তাঁর মতে হাইজেনবার্গের দক্ষতা ছিল কি ছিল না তার উপর নির্ভর করে জার্মানির পারমাণবিক বোমা প্রকল্পের অগ্রগতি নির্দিষ্ট হয়নি, বরং আর্মি অর্ডন্যান্স অফিস ১৯৪২ সালে এই বিষয়ে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে কারণ তারা মনে করেছিল যে যুদ্ধের ফলাফলকে প্রভাবিত করার মতো চটজলদি কোনো রাস্তা বাৎলানোর সম্ভাবনা এই প্রকল্প থেকে বেরিয়ে আসবে না।

"জার্মানরা কি পরমাণু বোমা বানানোর চেষ্টা করেছিল?"

তাঁর গবেষণা, "নাজি সাইন্স: মিথ, ট্রুথ, এন্ড দা জার্মান অ্যাটমিক বম্ব" বইটিতে ১৯৯৫ সালে প্রফেসর ওয়াকার বহু আলোচিত এই জটিল প্রশ্নের যে উত্তর তুলে ধরেছেন, সম্ভবত এ বিষয়ে সেটাই আমাদের সত্যের সব থেকে কাছাকাছি পৌঁছে দেয়। ওয়াকার যুক্তি দেন যে জার্মানরা বিস্ফোরণ যন্ত্র বানানোর জন্য বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করে বিশাল কারখানা নির্মাণ করেনি। কিন্তু যুদ্ধের প্রচেষ্টাকে বাধা না দিয়ে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, সম্ভাব্য পারমাণবিক বিস্ফোরক হিসাবে পরিচিত পদার্থ তৈরি করেছিল তারা।

যদি প্রশ্ন ওঠে, পারমাণবিক বোমা তৈরির কতটা কাছাকাছি ছিল নাজিরা? সত্যিটা হল হিরোশিমা বা নাগাসাকিতে যে ধরনের পারমাণবিক বোমা ফেলা হয়েছিল, সেরকম অস্ত্র জার্মানি তৈরি করতে পারেনি। তার কারণ এই নয় যে জার্মানিতে বিজ্ঞানী, বা ইচ্ছার অভাব ছিল, বরং ওদেশের নেতারা বিশেষ একটা চেষ্টাই করেনি বলে। জার্মানরা অবশ্যই যুদ্ধ জয়ের চেষ্টা করছিল। রকেট, জেট প্লেন, এবং আরও নানা ধরনের মারাত্মক বিদেশী সামরিক প্রযুক্তির ব্যবহার এবং উন্নয়নে তারা মোটেই গররাজি ছিল না; তো পারমাণবিক বোমা কী দোষ করল? আসল কথা হল পারমাণবিক

বোমা তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় আইসোটোপগুলিকে আলাদা করতে করতেই নাজি জার্মানির সময় ফুরিয়ে গেছিল। সোজা কথায়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় পারমাণবিক বোমা তৈরি করবার ক্ষমতা জার্মানির ছিল না। কারণ না ছিল তাদের লোক, না ছিল টাকা, না ছিল ল্যাবরেটরি, বা কারখানা তৈরির উপযুক্ত জায়গা। যেসব বিজ্ঞানীরা সেই প্রকল্পে কাজ করছিলেন তাঁদের মধ্যে পারস্পরিক সমঝোতারও বিশেষ অভাব ছিল। এসবের পরেও যদি তারা সেরকম কিছু তৈরি করতে সক্ষম হতো, মিত্রবাহিনীর আক্রমণ থেকে তা বাঁচিয়ে রাখার ক্ষমতা তাদের ছিল না।

মজার ব্যাপার আলোচনার উপসংহারে ওয়াকারও অবশ্য স্বীকার করেছেন, এ প্রশ্নের কোন সহজ উত্তর নেই।

২০০৫ সালে মার্কিন পাবলিক ব্রডকাস্টিং টিভি নেটওয়ার্ক পি বি এস-এর নোভা ইন্টারভিউ শো "হিটলার'স সাঙ্কেন সিক্রেট"-এ ওয়াকার বিশ্লেষণ করেন যে হাইজেনবার্গ এবং তার সহকর্মীরা পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি প্রকল্প অস্বীকার করে হিটলারকে প্রতিহতও করেননি; তাঁদের গবেষণার গতি কমাননি বা গবেষণার মুখ অন্য কোনোদিকে ঘোরাবার চেষ্টাও করেননি। তবে, এটা অত্যন্ত স্পষ্ট যে ডিইবনারের পারমাণবিক যন্ত্রে কাজ করা বিজ্ঞানীদের বাদ দিয়ে, বাকিরা পারমাণবিক বোমা তৈরির জন্য তেমন কোনো কঠিন চাপও দেননি। নায়ক বা খলনায়ক এর কোনোটাই নয়, তাঁরা শুধুমাত্র ছিলেন হিটলারের জার্মানির জন্য গণবিধ্বংসী অস্ত্র নিয়ে কাজ করা বিজ্ঞানী।

হাইজেনবার্গ বা ওয়েইজস্যাকার বা অন্য কেউ গোপনে পারমাণবিক বোমা তৈরি নষ্ট করেছে এই চিন্তা অমূলক। জার্মানির শিল্প ও বৈজ্ঞানিক সক্ষমতা এই প্রকল্পের সুযোগের জন্য অপর্যাপ্ত ছিল। তাই আমেরিকা পারমাণবিক বোমা ফেলেছিল ৬ আগস্ট, জার্মানি নয়।

এ যেন নানা মুনির নানা মত। বিষয়ের যত গভীরে প্রবেশ করছি তত ধোঁয়াশা বাড়ছে। আরও জানতে হবে। ভাবলাম, তাত্ত্বিক মানুষেরা তো অনেক কাঁটাছেঁড়া করলেন এ ব্যাপারে; দেখি না শিল্পী মানুষেরা কোন তুলিতে আঁকেন হাইজেনবার্গকে! মন বলছে, সেটা হবে নিরপেক্ষ এবং মানবিক। ইন্টারনেট ঘাঁটাঘাঁটি করতে করতে জানতে পারলাম যে ইংরেজ নাট্যকার ও ঔপন্যাসিক মাইকেল ফ্রেইন "কোপেনহেগেন" নামে একটা কল্পনাটক লিখেছেন। শুনেই মনটা আশায় আশায় দুলে উঠল, এইবার বুঝি মিলে গেল তুরুপের তাস!

কোপেনহেগেনে পরমাণু বোমা নিয়ে আলোচনা করার জন্য দুই নোবেল বিজয়ী নিলস বোর এবং হাইজেনবার্গের মধ্যে ১৯৪১ সালের সেপ্টেম্বরে যে গোপন বৈঠক হয় ইতিহাস তার সাক্ষী। ফ্রেইন তাঁর নাটকে বোর আর বোরের স্ত্রী মার্গ্রেথের সঙ্গে, হাইজেনবার্গের সেই রহস্যজনক সাক্ষাৎকারেরই এক কাল্পনিক ছবি এঁকেছেন। ১৯৯৮ সালে ফ্রেইন নাটকটি মঞ্চস্থ করেন এবং সেটা দারুণ জনপ্রিয় হয়; ২০০০ সালে বহুল ইপ্সিত "টনি অ্যাওয়ার্ড"ও জেতে এটি।

এতটুকু জেনেই তো আমার উত্তেজনা তুঙ্গে এসে পৌঁছাল। ভাবুন ব্যাপারটা একটু: হিটলারের অন্যতম প্রধান পারমাণবিক বিজ্ঞানী হাইজেনবার্গ কিনা গোপনে দেখা করতে এসেছেন, তাঁরই একসময়ের সহকর্মী, পরামর্শদাতা, ম্যানহাটন প্রকল্পের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, নিলস বোরের সাথে! আর কখন? না দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের তান্ডবলীলা যখন পুরোদমে বিদ্যমান! কেন এসেছেন হাইজেনবার্গ? কী কথা হয় একসময় পিতা-পুত্রের মতো কাছাকাছি, অথচ এখন দুই বিপরীত যুদ্ধ-শিবিরের মহাবিজ্ঞানীর? আচ্ছা, হাইজেনবার্গ কি জার্মান পারমাণবিক প্রকল্পের অগ্রগতির ব্যাপারে বোরের পরামর্শ নিতে এসেছিলেন? না কি বোরকে বোঝানোর আশা নিয়ে গিয়েছিলেন যে এরকম একটা বোমা তৈরি করতে গেলে দুই পক্ষেরই অনেক অর্থক্ষয় হবে, সুতরাং এ থেকে বিরত থাকা সকলের জন্যই মঙ্গল? হাইজেনবার্গের স্ত্রী কিন্তু তাঁর স্মৃতিকথায় এই শেষ কারণটাই বর্ণনা করেছেন। আচ্ছা এও তো হতে পারে, ওঁদের কথোপকথনের ভিত্তিতেই ঘুরে গেছিল বিশ্বযুদ্ধের মোড়। প্রশ্ন, প্রশ্ন আর প্রশ্ন! অনেক প্রশ্ন। সব উত্তর কি ইতিহাসও জানে?

নাটকটার খুঁটিনাটি জানার জন্য কৌতূহলে ছটফট করতে লাগলাম। ফ্রেইনের লেখা মূল নাটকটা মঞ্চে দেখার সৌভাগ্য আমার হয়নি বটে, কিন্তু থ্যাংকস্‌গিভিং-এর ছুটির সময় অনেক খোঁজাখুঁজির পর কাউন্টি লাইব্রেরি থেকে হাতে

এসে গেল নাট্য-সংলাপের বইটা। বেশ কয়েকবার পড়ে ফেললাম। তবু, দুধের স্বাদ কি ঘোলে মেটে? অগত্যা, আবার গুগলেদেবের শরণাপন্ন হতে হল এবং কপালগুণে এবার আমার হাতে এসে গেল, মূল নাটকটির অবলম্বনে হাওয়ার্ড ডেভিসের লেখা ও পরিচালিত ২০০২ সালের বিবিসি টিভি মুভি "কোপেনহেগেন"। এই সিনেমায় হাইজেনবার্গের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন প্রখ্যাত ব্রিটিশ অভিনেতা ড্যানিয়েল ক্রেইগ। বোর দম্পতির নামভূমিকায় আছেন স্টিফেন রিয়া, এবং ফ্রান্সেসকা আনিস।

নাটকটি শুরু হয় এইরকম এক পটভূমিতে:

ইউরোপ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে পারমাণবিক গবেষণায় সে সময় দারুণ প্রতিযোগিতা। বেচারা হাইজেনবার্গ ইহুদি, জার্মানিতে একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন। ফলে গত দুই বছরের মধ্যে ইতালীয় পদার্থবিদ এনরিকো ফার্মি যে পারমাণবিক চেইন রিঅ্যাকশনে দারুণ সাফল্য অর্জন করেছেন এই তথ্য সম্বন্ধে হাইজেনবার্গ সম্পূর্ণ অজ্ঞ রয়েছেন। আইনস্টাইন ওদিকে তখন ওপেনহাইমারের সাথে ম্যানহাটন প্রকল্পে কাজ করছেন। বোর এবং তার স্ত্রী মার্গ্রেথে হাইজেনবার্গের আগমনের অপেক্ষায়।

ফ্রেইনের হাইজেনবার্গ কিন্তু মোটেই সেই "কুৎসিত জার্মান" নন পল রোজ যাঁর ছবি এঁকেছেন, আবার তিনি জাংকের বা পাওয়ার-এর বইয়ে বর্ণিত নায়কও নন। হাইজেনবার্গ যেন পরস্পরবিরোধী চাপের মধ্যে নিষ্পেষিত একজন মানুষ, যাঁর জীবনটাই যেন এক বহমান অনিশ্চয়তার প্রতীক।

"কোপেনহেগেন" যেন একটা নিটোল কবিতা, মুহুর্মুহু ধাক্কা দিচ্ছে আমার আবেগের জন্মকেন্দ্রে, সমূলে নাড়া দিচ্ছে আমার ধর্মনীতির ধ্যানধারণার কোরকে। সময় আর স্থানের হিসেবে গুলিয়ে যাচ্ছে। চারপাশের অনিশ্চিত বাস্তবতা আর ঘোর নিশ্চয়তার সীমারেখাগুলো কেমন যেন ভেঙেচুরে একাকার হয়ে যাচ্ছে। নাটকটা শেষ হয়ে গেলেও থম মেরে বসে রইলাম অনেকটা সময়। মনে হচ্ছিল: এ তো আর কিছু নয়, মানব জীবনের ঘাতপ্রতিঘাতের মোড়কে জড়িয়ে থাকা কিছু সম্পর্কের স্মৃতিচারণ, অন্তর্দ্বন্দ্বে খানখান হয়ে যাওয়া কিছু ব্যক্তিত্বের অসহায়তা-ঠিক যেমনটি আমরা লক্ষ্য করি শেক্সপিয়ারের "হ্যামলেট" নাটকে। ঘরের বাতাসে যেন তখনও ভেসে রয়েছে হাইজেনবার্গের করুণ আর্তির রেশ, "বিশ্ব কেবল দুটি জিনিসই মনে রেখেছে আমার সম্পর্কে: একটি হল অনিশ্চয়তা নীতি, এবং অন্যটি ১৯৪১ সালে কোপেনহেগেনে নিলস বোরের কাছে আমার রহস্যময় সফর। সবাই অনিশ্চয়তা বোঝে অথবা ভাবে তারা বোঝে। কিন্তু কেউ আমার কোপেনহেগেনে ভ্রমণের কারণ বোঝে না। আমি বারবার ব্যাখ্যা করেছি সে কথা: স্বয়ং বোর এবং মার্গ্রেথের কাছে; জিজ্ঞাসাবাদকারী গোয়েন্দা কর্মকর্তাদের কাছে; সাংবাদিক এবং ইতিহাসবিদদের কাছে। আমি যত বেশি ব্যাখ্যা করেছি, অনিশ্চয়তা ততই আরও গভীর হয়েছে। ঠিক আছে, আমি খুশি হব তবু আরও একটি বার প্রচেষ্টা করতে পারলে। এখন আমরা সবাই মৃত এবং এই পৃথিবী থেকে চলে গেছি। এখন আর কাউকে আঘাত করা যাবে না, এখন আর কারও সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করা যাবে না।"

আচ্ছা একথাটা ভাবলেই আমার আশ্চর্য লাগে যে যাঁরা ঐরকম সাংঘাতিক বিস্ফোরক ক্ষমতার পরমাণু বোমা দুটো বানালেন, যা হিরোশিমা আর নাগাসাকির প্রাণ চাঞ্চল্যে ভরপুর শহর দুটোকে রাতারাতি মাটির সাথে মিশিয়ে দিল, ২০০,০০০ জনেরও বেশি লোককে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে হত্যা করল, এবং পরবর্তীতে বিকিরণের দীর্ঘমেয়াদী পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া থেকে আরও অনেক মানুষকে ক্যান্সারে আক্রান্ত করল, তাদের দিকে কেউ আঙ্গুল তুলে গম্ভীরমুখে অনিশ্চয়তায় মাথা নাড়েন না: অথচ যে মানুষটা সেই বিধ্বংসী প্রকল্পের সামিল ছিল না, সজ্ঞানেই হোক বা অজ্ঞানতার জন্যই হোক, হিটলারের হাতে মারণবোমা তুলে দেননি, তাঁকে নিয়েই কেন এত কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি, সন্দেহ আর তিক্ত সমালোচনার ঢেউ? জিলার্ড তো নিজেই পরে বলেছিলেন যে সেদিন যদি অত ভয় পেয়ে আইনস্টাইনকে পীড়াপীড়ি করে তিনি চিঠিটি না লেখাতেন তাহলেই তো আর আমেরিকানদের হাতে বোমা আসত না, আর জাপানে এত ধ্বংসলীলা

হতো না, ওঁরা তো সবাই ততদিনে বুঝে গেছিলেন, যে জার্মানি কোনো বোমা তৈরি করেনি, ওই সময়ের মধ্যে করতেও পারবে না, তাহলে আবার কেন এত জল্পনা কল্পনা যে হাইজেনবার্গ বোমা তৈরি করতে হিটলারকে সাহায্য করেছিল, ইত্যাদি, ইত্যাদি। ১৯৪৪ সালের মধ্যে, এটা পরিষ্কার হয়ে গেছিল: জার্মানরা বোমা তৈরির ধারেকাছে আসেনি, শুধুমাত্র প্রাথমিক গবেষণায় অগ্রসর হয়েছিল। জার্মান পরাজয়ের পর, মিত্ররা ৩ জুলাই, ১৯৪৫ থেকে ৩ জানুয়ারী, ১৯৪৬ পর্যন্ত ইংল্যান্ডের গডম্যানচেস্টারের ফার্ম হলে, দশজন জার্মান বিজ্ঞানীকে আটক করে। ফার্ম হলের আনাচেকানাচে লুকানো ছিল মাইক্রোফোন যাতে জার্মান পদার্থবিদদের প্রতিটি কথোপকথন রেকর্ড হয়ে যায়। এই বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে কয়েকজন, যেমন হাইজেনবার্গ, কার্ট ডিবনার এবং কার্ল ভন ওয়েইজ্যাকার জার্মান পরমাণু প্রকল্পের সাথে সরাসরি জড়িত ছিলেন, অন্যরা, যেমন অটো হ্যান এবং ম্যাক্স ভন লাউ, শুধুমাত্র সন্দেহের তালিকায় ছিলেন এবং পরে প্রমাণিত হয়েছিল যে তাঁদের কোনো ভূমিকা ছিল না। হিরোশিমায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পারমাণবিক বোমা ফেলেছে, শোনামাত্রই হাইজেনবার্গ বলে উঠেছিলেন "I don't believe a word of the whole thing," – এই ব্যাপারটাই মিত্রদের মনে নিশ্চিত করেছিল যে, বোমা বানানোর প্রচেষ্টায় জার্মানি এর ধারেকাছেও ছিল না; একজন জার্মান বিজ্ঞানী তো চিৎকার করে বলেই ফেলেছিলেন, "অত ইউরেনিয়াম-২৩৫ তৈরি করতে মনে হয়, গোটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমান বড় একটা কারখানা লেগেছিল!

সুধীগণ, বুকে হাত দিয়ে একবার বলুন তো: আপনাদের কি একটুও কষ্ট হয় না হাইজেনবার্গের জন্য? যেমনটি আপনাদের হয়েছিল মহাভারতের হতদশা কুন্তিসূত মহারথী কর্ণের জন্য। বীরভোগ্যা বসুন্ধরাও যে মাঝে মাঝে উদাসী মুখটি ফিরিয়ে নেন, তাঁরই এক সময়কার বরপুত্রের দিক থেকে ।

আর অনিশ্চয়তার কথা বলছেন? হাইজেনবার্গের মতো পরিস্থিতির চাপে পড়েনি এরকম মানুষেরাও যখন তাদের নিজস্ব উদ্দেশ্য এবং অভিপ্রায় সম্পর্কে কিছু বলে, সবাই কি তা নিশ্চিতভাবে বুঝতে পারে? কারুর কি কোনো ধন্দ থাকে না? উত্তরটা তো আপনি জানেন, আমিও। আমাদের নিজেদের চিন্তা ও উদ্দেশ্যও যে সততই পরিবর্তনশীল, সময় সময় তো ধরাছোঁয়ার বাইরেই থেকে যায়। পৃথিবীতে কোনও ধরণের একক চিন্তা বা উদ্দেশ্য নেই যা কখনও সুনির্দিষ্টভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। অনিশ্চয়তা তো জীবনেরই আরেক নাম। হাইজেনবার্গকে ঘিরে বিতর্ক অব্যাহত রয়েছে, কারণ তাঁর জীবন সম্ভবত এ ব্যাপারে সহজ উত্তর দেয় না। অনিশ্চয়তা আর জটিলতা এ দুইই যেন হাইজেনবার্গের জীবনের রূপক হিসেবে কাজ করছে। সব থেকে বড়ো কথা, আমরা তো জানিই যে, একটা জটিল সিস্টেমের পদার্থবিদ্যা কেবল তার পৃথক অংশগুলির সম্মিলিত আচরণ থেকে বোঝা যায় না। হাইজেনবার্গকে যদি সত্যি আমরা ভালোভাবে বুঝতে চাই, তাহলে তাঁর সম্পর্কে আগের থেকেই ধরে রাখা মতামত হাতিয়ার করে এগোলে হবে না, বরং তাঁর জীবনের একটি সামগ্রিক ছবি আমাদেরকে নিরপেক্ষ ভাবে যাচাই করতে হবে।

তথ্যঋণ:

১. Brighter Than a Thousand Suns: A Personal History of the Atomic Scientists. by Robert Jungk,

২. Heisenberg's War: The Secret History Of The German Bomb. by Thomas Powers

৩. Heisenberg and the Nazi Atomic Bomb Project, 1939-1945. A Study in German Culture. by Paul Lawrence Rose

৪. Nazi Science: Myth, Truth, And The German Atomic Bomb. by Mark Walker

৫. Copenhagen. by Michael Frayn

# সৌমিক বসু

## ফুটবল সম্রাট

সেও আর এক ১৬ই জুলাইয়ের গল্প। ১৬ই জুলাই, ১৯৫০। ব্রাজিলের রিও-ডি-জেনিরো শহরের মারাকানা স্টেডিয়ামে উরুগুয়ে এবং ব্রাজিলের ফাইনাল রাউন্ডের ম্যাচ। ম্যাচে যে জিতবে, বিশ্বকাপ তার দখলে যাবে। ফিফার সরকারি হিসাব অনুযায়ী সেই ম্যাচে ১,৭৪,০০০ দর্শক সমাগম হয়েছিল, কিন্তু বেসরকারি হিসাবে সংখ্যাটা ২,০০,০০০ ছাড়িয়ে গিয়েছিলো।

ঘরের মাঠে বিশ্বকাপ আয়োজন করে এবং প্রাথমিক পর্বের ম্যাচগুলোতে দুর্দান্ত খেলে ব্রাজিল পরিষ্কার ফেভারিট হিসাবে খেলা শুরু করে। ব্রাজিলের ক্রীড়ামোদী থেকে শুরু করে প্রেসিডেন্ট সবাই জয়ের ব্যাপারে নিঃসন্দেহ ছিলেন, সব সংবাদপত্রে ঘোষণা করা হয় ব্রাজিলের জয় শুধু সময়ের অপেক্ষা। কিন্তু ব্রাজিলের নিয়তিতে অন্য কিছু লেখা ছিলো। তুমুল প্রতিদ্বন্দ্বিতার পরে ব্রাজিল ২-১ গোলে পরাজিত হয়, সেই অভিশপ্ত ম্যাচটিকে ফুটবলের ইতিহাসে অন্যতম বড়ো অঘটন হিসাবে ধরা হয়ে থাকে।

বলা হয়ে থাকে ম্যাচের পরে ব্রাজিলের উপর সেই হারের প্রভাব বহুদিন থেকে গিয়েছিলো এবং পরবর্তিকালে বহু মোড় ঘোরানো ঘটনার সূত্রপাত করেছিলো –

১. ব্রাজিল গোলকিপার বারবোসা ৩০' এবং ৪০'-এর দশকে বিশ্বের সেরা গোলকীপার হওয়া সত্ত্বেও এই পরাজয়ের জন্যেই তাঁকে সারাজীবন খলনায়ক প্রতিপন্ন করা হয় এবং বহুস্থানে খারাপ ব্যবহারের সাক্ষী হতে হয়।

২. পরবর্তী ২ বছর ব্রাজিলের জাতীয় দল কোনো আন্তর্জাতিক ফুটবল ম্যাচে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকে এবং মারাকানা স্টেডিয়ামকে পরবর্তী আন্তর্জাতিক ম্যাচ আয়োজনের জন্যেই ৪ বছর অপেক্ষা করতে হয়।

৩. জনরোষের আগুন শান্ত করতে ব্রাজিল ফুটবল ফেডারেশন জাতীয় দলের জার্সি পরিবর্তন করতে বাধ্য হন। সেই সময় ব্রাজিলের জার্সি এবং শর্টসের রং ছিল সাদা। একটি প্রতিযোগিতার মাধ্যমে জার্সির ডিজাইন নির্বাচনের আমন্ত্রণ জানানো হয়। সেই প্রতিযোগিতায় জয়ী হয় ব্রাজিলের বর্তমান জার্সির ডিজাইন, অর্থাৎ হলুদ জার্সি এবং নীল শর্টস। যা পরবর্তীকালে বিশ্বের আপামর ক্রীড়াপ্রেমীদের হৃদয়ে স্থান করে নেয়।

৪. মারাকানা স্টেডিয়ামে ম্যাচ শেষের পরে দুইজন দর্শক আত্মহত্যা করেন, দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আরো বেশকিছু আত্মহত্যার ঘটনার খবর আসতে থাকে।

এতো কিছু ঘটনার পাশে সেই ম্যাচের পরে একটি ছোট্ট ঘটনাও ঘটেছিলো। সেইদিন ফাইনালে মারাকানাতে উপস্থিত ছিলেন আতলেতিকো মিলেইরো এবং ফ্লুমিনেসের প্রাক্তন স্ট্রাইকার ডনডিনহো। ডনডিনহো সেই ট্রাজিক ম্যাচের পরে অশ্রুসজল চোখে বাড়ি ফিরে এলে তার ১০ বছর বয়সী পুত্র তাকে সান্তনা দিয়ে বলে "বাবা, চিন্তা কোরো না। একদিন ব্রাজিলের জার্সি পরে ফুটবল খেলে আমি ব্রাজিলকে বিশ্বকাপ এনে দেবো।"

সেই শিশুর নাম এডসন। পুরো নাম এডসন আরান্তেস ডু নাসিমেন্টো। মাত্র ৮ বছরের মধ্যেই সেই শিশু তার কথা রাখতে পেরেছিলো। গোটা দুনিয়া তাঁকে এরপর পেলে নামে চিনবে।

১৯৪০ সালে তাঁর জন্মের কিছুদিন আগে তাঁর ছোট্ট গ্রামে ত্রেস কোরাকোয়ে ইলেকট্রিক বাল্বের ব্যবহার চালু হয়। তাঁর অভিভাবকেরা ইলেকট্রিক বাল্বের অমরস্রষ্টা টমাস আলভা এডিসনকে সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে সদ্যজাত সন্তানের নাম রাখেন এডসন। কিভাবে যে নামের থেকে ই-কার টি গায়েব হয়ে গিয়েছিলো, সে তথ্য অজানাই রয়ে যায়। পেলে তাঁর আত্মজীবনীতে লিখছেন .... "They gave me the name "Edson" — after Thomas Edison, because when I was born in 1940, the electric lightbulb had only recently come to their town. They were so impressed that they wanted to pay homage to its inventor. It turned out they missed a letter — but I've always loved the name anyway."

ছেলেবেলা থেকেই পুরো নাম জানতাম। জানতাম, ওই কালো রঙের সুঠাম চেহারার মাঝারি উচ্চতার লোকটি আমার বাবা কাকাদের যৌবনে বিশ্ব মাতিয়েছেন। আমাদের ছেলেবেলায় এক আশ্চর্য সম্রাট হয়ে বসে ছিলেন।

ব্রাজিলকে ভালো লাগা আদতে তো পেলের নাম শুনে। আমরা কোনোদিন পেলেকে দেখিনি, তবু যেন মনে হয় বহুবার পেলেকে দেখেছি। আর তাঁকে নিয়ে শুনেছি এতো, মনে হয় সব কিছু নিজের চোখেই দেখা, উপলব্ধি করা।

যেমন পুরোনো আনন্দমেলা ঘাঁটতে ঘাঁটতে আবিষ্কার করা তাঁর কলকাতা আগমন নিয়ে লেখা প্রেমেন্দ্র মিত্রের কোনো ছড়া –

"পেলে ! পেলে ! পেলে !
সত্যি তবে এলে
বরাতজোরে টিকিট একটা পেলে।
বিস্ফারিত চক্ষুদুটি মেলে
দেখবো এবার দুনিয়া মাতাও
কি কেয়াবাত খেলে।"

পরে আসছি বিশদে সেই কলকাতা পর্ব নিয়ে, আপাতত দেখা যাক পেলের ফুটবল সম্রাট হয়ে ওঠার কাহিনী।

**প্রথম ম্যাচেই বিশ্বরেকর্ড**

ব্রাজিলের হয়ে পেলের আন্তর্জাতিক ফুটবল ক্যারিয়ার শুরু হয় চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী আর্জেন্টিনার বিপক্ষে। ১৯৫৭ সালের সেই ম্যাচে ব্রাজিল আর্জেন্টিনার কাছে ২-১ গোলের ব্যবধানে হেরে গেলেও প্রথম ম্যাচেই বিশ্ব রেকর্ডটি করেন পেলে। ১৬ বছর ৯ মাস বয়সে গোল করে অর্জন করেন আন্তর্জাতিক অঙ্গনের সর্বকনিষ্ঠ গোলদাতার রেকর্ড।

**বিশ্বকাপ ফুটবল**

১৯৫৮ সালের বিশ্বকাপে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিপক্ষে পেলের অভিষেক ঘটে। ১ম রাউন্ডের খেলায় পেলে গোল করতে না পারলেও কোয়ার্টার ফাইনালের ওয়েলসের বিপক্ষে পেলের করা গোলে ব্রাজিল সেমিফাইনালের টিকিট নিশ্চিত করে এবং পরবর্তীতে ব্রাজিল স্বাদ পায় প্রথম বিশ্বকাপ জয়ের। এই গোলটিও ছিল বিশ্বকাপের ইতিহাসে সর্বকনিষ্ঠ খেলোয়াড়ের গোল। ১৯৫৮ সালের বিশ্বকাপ ফাইনালে জোড়া গোল করে ব্রাজিলের প্রথম বিশ্বকাপ জয়ের নায়ক বনে যান ১৭ বছর বয়সী পেলে।

**১০০০ গোল**

পেলে তার ক্যারিয়ারের ১৩৬৩ ম্যাচে গোল করেছেন ১২৮৩টি। ১৯৬৯ সালের নভেম্বরে ভাস্কো-দা-গামা ক্লাবের বিপক্ষে ব্রাজিলিয়ান লিগের এক ম্যাচে যেদিন করলেন তাঁর হাজারতম গোল, সেদিন পুরো ব্রাজিল মেতে উঠেছিল উৎসবে। কোনো একক খেলোয়াড়ের গোল করার ব্যাপারে এটিই ছিল বিশ্বরেকর্ড।

আমরা তাঁকে দেখেছি স্যুটেড বুটেড হয়ে ফিফার মঞ্চ আলো করে বসে থাকতে, ঠিক যেন অদৃশ্য মুকুট পরে সম্রাট। শৈশবে জানতাম, পেলে মানে ফুটবলের রাজা। বড় হয়ে জানলাম, পেলে মানে এক স্বর্গীয় হাসি। পেলে মানে এক সৌজন্যবোধ। এত স্বর্গীয় হাসি কোনও খেলাতেই কেউ দেখাতে পারেননি। ফুটবলের রাষ্ট্রদূত হিসাবে পেলে ছাড়া বোধহয় আর কাউকে ভাবা সম্ভব নয়।

পেলে মানে ব্রাজিল। পেলে মানে মোজায় কাগজ গুঁজে অজপাড়াগাঁর ফুটবল। পেলে মানে হলুদ নীল বর্ণের নিচে ভালবাসা খুঁজে ফেরা হাজার হাজার কিশোরের স্বপ্ন। পেলে মানে ৫৮'র বিস্ময় বালক। ৬৬'র ট্রাজিক নায়ক, আবার '৭০ বিশ্বকাপে জেয়ারজিনহোর কাঁধে চেপে একহাত মুঠো উল্লাস। পেলে মানে স্যান্টোসের বিবর্তন, স্যান্টোসের বর্ণময় ইতিহাস। আবার ১০ নম্বর জার্সি পরা মানেই তুমি টিমের সেরা ফুটবলার – এই তত্ত্বটা পাড়ার ফুটবলের থেকে বিশ্বকাপেও প্রতিষ্ঠা করে গেছেন স্বয়ং পেলে। দশ নম্বর জার্সিকে অমরত্ব দিয়ে গিয়েছেন পেলেই।

পেলেই প্রথম মানুষ, যার ফ্রেস্কো আঁকা হল ব্রাজিলের পথে। অলিতে-গলিতে কিশোররা একটা চামড়ার বল নিয়ে স্বপ্ন দেখতে শুরু করল ফুটবলার হওয়ার। ড্রেনের নোংরা জলের পাশ থেকে উঠে আসা অসংখ্য কিশোর ফুটবলকে জড়িয়ে ধরে বাঁচতে চাইতো কারণ তাদের হিরো ব্ল্যাক পার্ল পেলে বিশ্বকাপে গোল করছে, দেশকে ট্রফি এনে দিচ্ছে। এমনকি দূর ভারতবর্ষের মানুষ তাঁকে আপন করে নিয়েছে আমাদের "কালো মানিক" বলে। কোথাও গিয়ে যেন ফুটবলের দুনিয়ার নেলসন ম্যান্ডেলা স্বয়ং পেলে।

পেলে আসলে যেন একটি রূপক। এই সেদিন যখন বিশ্বকাপে রিচারলিসন ব্যাকভলি মারেন তখন তিনি পেলে হয়ে যান। রোনাল্ডো যখন উইং বরাবর দৌড় মারেন তখন তিনি পেলে হয়ে যান, রোনাল্ডিনহো যখন শরীরের এক বাঁকে ডিফেন্ডারকে পরাস্ত করেন তখন তিনি পেলে হয়ে যান, বাঁ পায়ে গোলার মতো শট নিয়ে লিয়েনেল মেসি পেলে হয়ে যান, আকাশে ভাসতে ভাসতে হেড দিতে গিয়ে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো পেলে হয়ে যান।

সেই যুগে মিডিয়ার বিস্ফোরণ এখনের মতন হলে পেলেকে নিয়ে উন্মাদনা কোন পর্যায়ে পৌঁছাতো ভাবতে অবাক লাগে। সেরা সময়ের রিয়াল মাদ্রিদ প্রস্তাব দিয়েছিল পেলেকে তাদের দলে যোগ দেওয়ার। সেটা ১৯৫৮ সাল। ইউরোপের ফুটবল বিশ্বযুদ্ধের ক্ষত কাটিয়ে নতুন করে জেগে ওঠার আপ্রাণ চেষ্টা করছে। আর্জেন্টিনা থেকে ডি স্টেফানো আর হাঙ্গেরি থেকে ফেরেঞ্চ পুসকাস স্পেনে চলে এসেছেন। যুদ্ধবিধ্বস্ত জার্মানি বিশ্বকাপ জিতে দুনিয়াকে বার্তা দিয়েছে। খোদ রাষ্ট্রপতি এসে পেলের ইউরোপ যাত্রা আটকে দিলেন। ব্রাজিল তাকে ঘোষণা করল জাতীয় সম্পদ হিসেবে।

পেলে-মাহাত্ম্য সরাসরি বোঝার সৌভাগ্য আমাদের ভারতীয়দের ছিল না। ১৯৭৭ তে পেলে অবশেষে এলেন কলকাতায়, আন্তর্জাতিক ম্যাচ থেকে অবসর গ্রহণের ৬ বছর পরে। তবু ভারতীয় ফুটবলের ১৯১১, ১৯৫১, ১৯৬২-র মতোই সেটা যুগান্তকারী ঘটনা হয়ে রয়ে গিয়েছে। সেদিনের ছোট্ট ছোট্ট ঘটনা ভারতীয় ফুটবলে মিথ হয়ে রয়ে গেছে। সেই বড়ে মিয়াঁর 'ইউ পেলে, আই মহম্মদ হাবিব', সেই গৌতম সরকারের জীবন বাজি রাখা ট্যাকল আর শেষমেশ শিবাজী ব্যানার্জির পেলের ফ্রিকিক বাঁচিয়ে হিরো হয়ে যাওয়া।

এমনকি পেলেকে নিয়ে একেকটা রসিকতা এমনই অমর হয়ে থেকে যায় ...

২৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৭। কলকাতার ফুটবলপ্রেমীদের কাছে সেই স্বপ্নের দিন। খোদ পেলেকে খেলতে দেখা গেল ইডেন গার্ডেনসে। পেলের নিউইয়র্ক কসমস ক্লাব প্রীতি ম্যাচ খেলল মোহনবাগানের বিরুদ্ধে। প্রবল বৃষ্টির ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে ম্যাচ তো হল, পেলে নামলেনও। কিন্তু তাঁর পায়ের জাদু সেভাবে দেখা গেল না। হতাশ বাঙালি রগড় করে বলল, "পেলে কোথায় ? উনি নাকি শান্তিগোপাল নেমেছিলেন পেলে সেজে।"

পেলেকে আমি খেলতে দেখিনি কখনও, তবু ওই চামড়ার গোল বলটা যখন সবুজ ঘাসের উপর দিয়ে ছুটে চলে, তখন মাঠের প্রত্যেকটা দর্শক পেলে হয়ে যায়। অচিন গাঁয়ের এবড়োখেবড়ো মাঠই হোক বা উত্তর কলকাতার এঁদো গলি বা মারাকানার প্রান্তর। প্রতিটি ফুটবলপ্রেমী কখনও না কখনও পেলে হয়ে গিয়ে ছড়িয়ে ছড়িয়ে গিয়েছে মাঠের প্রতিটি ঘাসের বিন্দুতে।

অন্য অনেক কিছুর মতই এই চিরকালীন তর্কটাও জীবনভর অমীমাংসিত থেকে গেলো। এই গ্রহের সর্বকালের সেরা ফুটবল শিল্পী কে? পেলে না মারাদোনা? মারাদোনার মৃত্যুর পরে পেলে লিখেছিলেন, "তোমার সঙ্গে একদিন ফুটবল খেলব আকাশে।" আকাশে এখন নিশ্চয় সম্রাট বনাম রাজপুত্রের সেই ম্যাচের প্রস্তুতি চলছে পুরোদমে। পেলের মাপের মানুষ তো প্রয়াত হন না, খেলতে খেলতে চলে যান দেশ, গ্রহের সীমানা পেরিয়ে অন্য দেশে। অন্য ফুটবল মাঠে।

লং লিভ দ্য কিং, লং লিভ দ্য এম্পেররর অফ ফুটবল।

# জানলার পাশে কফি

সাতসকালে ফ্লাইট ধরা, বুঝলেন, সত্যি এক কষ্টকর ব্যাপার। যদিও সিডনির এয়ারপোর্টে সোজা চলে যায় ট্রেন, তাও, ঘুম থেকে উঠে ঢুলতে ঢুলতে যেতে হয় আর শেষে চেক-ইন করে গরম কফির ধোঁয়ায় ঘুম কাটাতে হয়। কিন্তু কিছু করার নেই, যেতে তো হবেই, প্রাণের শহর কলকাতা বলে কথা, তার ওপর বইমেলা আসছে। কোভিডের পর এই প্রথম আবার ধোঁয়া ধুলো আর নতুন বইয়ের গন্ধ নেওয়ার সুযোগ বছরে তো একবারই হবে, ছাড়া যায় বলুন ? যায়না। আর তার ওপর **"বাতায়নের"** স্টল যখন থাকবে, আর থাকবে দেশ বিদেশের ছড়িয়ে থাকা "বাতায়নের" লেখক লেখিকাদের বই। এই নিয়ে কলকাতা বইমেলায় "বাতায়নের" দ্বিতীয়বার উপস্থিতি। কোভিডের আগে ওই ২০২০ তার পর এই ২০২৩।

সিঙ্গাপুর এয়ারলাইন্সের ফ্লাইট সিডনির কালো মেঘের স্তর ভেদ করে নীল আকাশ ছুঁতেই সুবেশা তরুণী হোষ্টেস দিয়ে গেল কফি আর কুকিজ। বিস্কুটকে কুকিজ বলার অভ্যাস অষ্ট্রেলিয়ায় এসে হয়েছে ঠিকই কিন্তু কফির চুমুক আজও মনে করিয়ে দেয় ফেলে আসা জীবনের কফি হাউসের আড্ডার দিনগুলো আর কলেজ স্ট্রিটকে। তখন তো আর এতো ইন্টারনেট আর স্যোসাল মিডিয়া ছিলো না। দোকানে দোকানে ঘুরে নতুন কোনো কবি বা লেখকের বই খুঁজে খুঁজে কেনা হতো আর পড়ার পর কফি হাউজে শনি বা রবিবার হতো বন্ধুদের সঙ্গে তর্ক বিতর্ক।

চটকা ভাঙলো এয়ার হোষ্টেসের কথায়, "ডু ইয়ু নিড মোর ?"

কফি শেষ হয়ে গেছিলো, তার চোখ এড়ায়নি ।

বললাম "ইয়েস প্লিজ"

স্মৃতি যে আসলে সতত মধুর, বারে বারে সে ফিরে আসে মনের জানলায়, কফির কাপে।

বাইরে তখন চোখ ধাঁধানো নীল, সূর্য ঠিক মাথার ওপরে। জানলা দিয়ে উঁকি দিলাম নীচে। সবুজ আর খয়েরী রঙের জিগ-শ-পাজেল, সরে সরে যাচ্ছে অস্ট্রেলিয়া। দক্ষিণ গোলার্ধ থেকে উত্তর গোলার্ধের দিকে উড়ে চলেছে আমাদের বোয়িং সেভেন থ্রি সেভেন। মোটামুটি রাতেই পৌঁছে যাব কলকাতায়। বইমেলা, অপেক্ষা করো, আসছি, খুব তাড়াতাড়ি দেখা হবে।

এয়ারলাইন্সের খাবার ভালোই দেয় বুঝলেন। এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখি সবাই চুপচাপ লাঞ্চে মনোনিবেশ করেছে আর শুধু বাইরে থেকে ভেসে আসছে প্লেনের ইঞ্জিনের একটানা শব্দ। যদিও রবীন্দ্রনাথ তো কবেই বলে গেছেন,

"আমসত্ব দুধে ঢালি, তাহাতে কদলি দলি, সন্দেশ মাখিয়া তাতে

হাপুস হুপুস শব্দ, চারিদিক নিস্তব্ধ, পিঁপড়া কাঁদিয়ে যায় পাতে ...। কিন্তু নাহ, প্লেনের ইঞ্জিনবাবাজীর আজ গুরুদায়িত্ব, ঠিকঠাক সময়ে টুপ করে আমাকে সিঙ্গাপুর পৌঁছে দিতে হবে তাকে, কলকাতার কানেক্টিং ফ্লাইট অপেক্ষা করছে, সামনেই বইমেলা বলে কথা।

দুপুরের খাবার খেয়ে চোখ দুটো একটু লেগে এসেছিলো। কানে ভেসে এলো বিশুদ্ধ বাংলায় কথাবার্তা। পিছনের সিট, মুখ ঘুরিয়ে একগাল হেসে বললাম "কলকাতা মনে হচ্ছে ?"।

লাফিয়ে উঠে বললেন "ঠাকুরপুকুর, আপনি ?"

আমি তো জটায়ু নই যে গড়পাড়ের বাঙালি বলবো। হিন্দমোটরের বাড়ির পরিচয় দিতেই চেনা পরিচিতি বেরিয়ে পড়লো। ওনার স্ত্রীর মাসতুতো দিদির বাড়ি আমাদের বাড়ির কাছাকাছিই। পথচলতি মানুষের সাথে বোধহয় এভাবেই আলাপ হয়। স্ত্রী ও ছোট্ট বাচ্চাকে নিয়ে অফিস থেকে ছুটি ম্যানেজ করে যাচ্ছেন।

জিজ্ঞেস করলাম "ইয়ার্লি ভ্যাকেশন নিশ্চয়ই ?"

বললেন "না না, ছেলেটার হাতেখড়ি দেবো বলে যাওয়া, অ আ ক খ না শিখলে চলে বলুন দাদা ? দিনের শেষে বাঙালি তো"।

ভদ্রলোকের ইতস্তত চোখ জানিয়ে গেলো সুদূর বিদেশে বাঙালি আজও তার ভাষাকে আঁকড়ে ধরে আছে, যেমনটা বাতায়নও ধরে আছে, দেশ বিদেশের লেখক লেখিকাদের নিয়ে। হয়তো এই ভদ্রলোক বাতায়নের কথা জানেন না, কিন্তু তাতে কি, শিকড়কে তো আর ইনি ভুলে যাননি ?

সেদিন বিকেলে সিঙ্গাপুর থেকে কলকাতার ফ্লাইট ঠিকঠাকই ছিলো। বিগত পনের বছরে বহুবার এই ফ্লাইট ধরে কলকাতায় ফিরেছি, কিন্তু প্রতিবার রাত পৌনে দশটা নাগাদ প্লেনের পিছনের চাকা কলকাতা এয়ারপোর্টের রানওয়ে ছোঁয়ার সময় ঝাঁকুনিটা লাগে, যেন মনে হয় এই শহরে কাছে গচ্ছিত রেখে যাওয়া স্মৃতি কাঁধে চাপড় মেরে বলছে "কিরে ফিরলি তাহলে ? আছিস কেমন ?"

অনেকটা সেই কলেজের ফার্স্ট ইয়ারে শোনা সুমন চট্টোপাধ্যায়ের গানের মতো,

"... পুরনো দোকানে বিগত আড্ডা, বিগত ঝগড়া বিগত ঠাট্টা, বন্ধু কি খবর বল কত দিন দেখা হয়নি ..."

এবার দেখা হবে, নতুন পুরনো বন্ধুদের সাথে, চায়ের আড্ডায়, বইয়ের মলাটে, বইমেলার বিকেলে।

এয়ারপোর্টে নেমে ইমিগ্রেশন ক্লিয়ার করা অব্দি সব মাখনের বুকে ছুরি চালানোর মত হয়ে গেল। কিন্তু গোল বাঁধলো কাষ্টমসে। অফিসার হাত তুলে দাঁড় করালো। কম বয়স, সদ্য চাকরিতে ঢুকেছে মনে হলো। দেখালাম আমার অষ্ট্রেলিয়ার পাসপোর্ট আর ভারত সরকারের ও.সি.আই. কার্ড দুটো। উল্টে পাল্টে দেখে কিরকম একটা দিকশূন্যপুরগামী দৃষ্টি দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বললো "আপ অষ্ট্রেলিয়ান হ্যায় ইয়া ইন্ডিয়ান ?" পাশে আরেকজন ছিলেন, সিনিয়ার হবেন হয়তো। বললেন "ওহ হো, আরে চক্রবর্তী হিন্দমোটর, হান্ড্রেড পার্সেন্ট ইন্ডিয়ান"। ছোকরা বিরস বদনে পাসপোর্ট আর ও.সি.আই. কার্ড ফিরিয়ে দিয়ে বললো "যাইয়ে"। মনে মনে বললাম –" you can take the person out of the place but you can't take the place out of the person"

বাইরে হাল্কা ঠান্ডা। জানুয়ারির সাতাশ তারিখের রাত এগারোটা ইঙ্গিত দিচ্ছে শীত এবারের মতো যাই যাই বলছে কিন্তু বেলঘরিয়া এক্সপ্রেসওয়ের নিওন আলো আর ট্রাফিকের ভীড় আমাকে জানান দিচ্ছে তিলোত্তমা তখনও জেগে আছে। বালীব্রিজের ওপর হাওয়ার ঝাপটা এসে কানে কানে বলে গেলো,

"যত দূরে যাও যত ভুলে থাকো তাকে, ফের সে নিওনজলে ভেজাবে তোমাকে,
অভিমানী দুই মুঠো খুলে দিও এসে, এ শহর ফের দেখো গল্পেতে মেশে"

মনে মনে ভাবলাম জানুয়ারির ত্রিশ থেকে আবার গল্প হবে, শহরের সাথে, বইমেলার সাথে।

যাই বলুন বইমেলার কিন্তু একটা আলাদা আমেজ আছে। ময়দান থেকে মিলনমেলা প্রাঙ্গণ হয়ে আজ তার পাকাপাকি ঠিকানা সল্টলেক-করুণাময়ী বাস স্ট্যান্ডের পাশের মাঠে। শিয়ালদহ স্টেশন থেকে এখন মেট্রো ধরলে বইমেলার দোরগড়ায় নামিয়ে দেয়। ভীড় করে আসে ধোপদুরস্ত পাঞ্জাবি আর সুসজ্জিতা শাড়িদের দল। সাহিত্যপ্রেমী

THE NATIONAL LIBRARY
বইমেলা প্রাঙ্গণ
Boimela Prangan
Paytm UPI
Pay at the fair using Paytm UPI
GATE 4


F6

বাতায়ন

BATAYAN INC, AUSTRALIA
অস্ট্রেলিয়া
F6
GOYAL

বাতায়ন

থেকে সাহিত্যবিমুখ সবার জন্য বইমেলার নয় নয়টি গেট উন্মুক্ত। প্রিয় লেখক লেখিকার স্বাক্ষরিত বই ও তার সঙ্গে সেলফি ? বইমেলা। তীর্থের কাকের মতো বসে আছেন কত যেন পার্সেন্ট ছাড় দেবে প্রকাশনী? বইমেলা। অফিস ফেরত রিফ্রেশমেন্ট ? বাউল গান ? হাতের কাজ কুটিরশিল্প ? বইমেলা। বন্ধু বান্ধবী প্রেমিক প্রেমিকার সঙ্গে আড্ডা, চা, কফি, ফিশ-কাটলেট বা চিকেন পকোড়া সহযোগে কোয়ালিটি টাইম ? বইমেলা। এই দশ দিন আজকের নেট দুনিয়ার বাঙালির কাছে অন্যতম সাংস্কৃতিক উৎসবে পরিণত হয়েছে।

যাইহোক, প্রথম দিন, চার নম্বর গেট দিয়ে মাঠে ঢুকতে গিয়ে সিকিউরিটি আটকালো। বলে, "ব্যাগে কি ?"

বললাম, "বইমেলায় ঢুকছি, বই ছাড়া আর কি থাকতে পারে দাদা ?" চুপচাপ ঢুকতে দিলো। বিকেল তখন তিনটে, মোটামুটি ভীড়। গিল্ডের প্যাভিলিয়নের সামনে সভাপতি ত্রিদিবদা মানে আমাদের চিরযুবক ত্রিদিব চট্টোপাধ্যায়, সপার্ষদ সহ। সামনে বুম, পাশে ক্যামেরা। ইন্টারভিউয়ের বাইট উঠছে। সিগনেটে উঁকি দিলাম যদি প্রিয় কবিদের মধ্যে কাউকে পাই। স্টল ফাঁকা। ইতি উতি চক্কর মেরে বাতায়নের স্টলে চলে গেলাম। স্টল সেজে উঠেছে। রয়েছে "মেঘযাপন", "এক বাক্স চকলেট", "ধুলো রংয়ের বিকেল" ও মুদ্রিত বাতায়ন-সংকলন সংখ্যা। কিন্তু এবারের স্টার অ্যাট্রাশন হতে চলেছিল "চা-ঘর"। লেখিকা রমা জোয়ারদার বহুদিন ধরে দিল্লীর প্রবাসী। ধারাবাহিক ভাবে বাতায়নের অনলাইন ম্যাগাজিন "কাগজের নৌকা"তে প্রকাশিত হবার পর দুই মলাটের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করতে চলেছে তার এই উপন্যাস। বাতায়নের কর্ণধার সবার প্রিয় অনুশ্রীদি তখনও এসে পৌঁছাননি। স্টলে চলে এলেন সিডনি নিবাসী কবি তপনজ্যোতি মিত্র। আমাদের প্রিয় মানুষ। তপনদারও কবিতার বই প্রকাশ হয়েছে এবারের বইমেলায়। সুদূর অষ্ট্রেলিয়া থেকে তাই চলে এসেছেন মেলায় নতুন বইয়ের সম্ভারে হারিয়ে যাবেন বলে। চা কফি হলো, আড্ডা হলো। আমার বইমেলা সফর চালু হলো।

বইমেলার স্টলে স্টলে না ঘুরলে আমার ঠিক তীর্থদর্শন হয়না। কবিতা-আশ্রম প্রকাশনীর স্টলে তখন বিকেলের ফেসবুক লাইভ হচ্ছে, পরিচয় হলো পৃথা, বিভাসদার সঙ্গে। কবি বিভাস রায়চৌধুরী কবিতা জগতের এক পরিচিত নাম। পৃথার সঙ্গে ফেসবুকে আলাপ ছিলো, এবার সাক্ষাতে হলো। আর হলো এক প্রস্থ চা। যাপনচিত্র স্টলের দিকে যাচ্ছিলেন কবি প্রবালকুমার বসু, কথা হলো, আর হলো এক প্রস্থ চা। এস.বি.আই অডিটোরিয়ামের অনুষ্ঠানে ভীড়। শেষ হতে মঞ্চ থেকে নেমে আসতে আসতে দূর থেকে হাত নাড়লেন আমাকে দেখে কবি সুবোধ সরকার। ভীড়ের মধ্যে হঠাৎ সামনে স্মরণজিৎ চক্রবর্তী। ওনার কবিতার বই কিনেছিলাম। সানন্দে হেসে অটোগ্রাফ সহ সেলফি তোলা হলো। পকেটের মোবাইল বেজে উঠলো, অপর প্রান্তে কবি বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়। ৫১১ নম্বর স্টলে আসতে বললেন, কবিতা পাঠ হবে। মুক্তমঞ্চে তখন ঝাঁকড়া চুল ছেঁড়া জিনস হাতে তুলে নিয়েছে গিটার, পাড়ায় ওকে হয়তো পিট সিগার বলে আড়ালে, সামনে শ্রোতাদের জটলা। লিটলম্যাগের স্টলে তখন বেশ ভীড়। মেলা প্রাঙ্গণের মাইকে রবীন্দ্রসঙ্গীত শেষ হবার পর সঞ্চালিকা জানাচ্ছেন কত কোটি টাকার বই বিক্রি হয়েছে। ভাষা নগরের মোবাইল স্টল থেকে মাইকে ভেসে আসছে কবি শিবাশীষ মুখোপাধ্যায়ের ঘোষণা "বই নিলে সই ফ্রি"।

পড়তে পড়তে নিশ্চয়ই ভাবছেন এটা বোধহয় একদিনের চিত্র ? না, ভুল করলেন, এটা বইমেলার প্রতিদিনের চিত্র। দশ দিন ধরে চলা সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক পরিমন্ডলের এই বিশাল কর্মযজ্ঞের অনুষ্ঠানে বাতায়নও তার চিহ্ন রেখে চলেছিলো সগৌরবে। বাতায়নের স্টলে এলেন কবি তন্ময় চক্রবর্তী, রেখে গেলেন কিছু তার কবিতার বই। ঘন্টা দুয়েকের মধ্যে সব বিক্রি হয়ে পাঠকের ব্যাগের মধ্যে মুখ গুঁজলো। পরে জানতে পেরে আক্ষেপ, "ইস আগে জানলে আরো কয়েকটা রাখতে পারতাম"। কখনওবা স্টলে চলে এলেন সাহিত্যিক অমর মিত্র, জমে উঠলো আড্ডা। ঘুরতে ঘুরতে এলেন প্রিয় কবি শ্রীজাত ও কবিজায়া। যথারীতি গল্প আড্ডা সেলফি ও চা চললো। ফেসবুক ও ফেসবুকের বাইরে অসংখ্য মানুষ বাতায়নের স্টলে এলেন আর নিয়ে গেলেন তাদের প্রিয় লেখকদের বই, সই সহ। কে বলে বাঙালি বই

SBI
SBI AUDITORIUM

FILA

বাতায়ন

বাতায়ন

Australia
FRANCE

F6

পড়তে ভুলে গেছে ? বিদেশেও যে বাঙালি শত প্রতিকূলতা জয় করে সাহিত্যচর্চা করছে তার স্বীকৃতি বোধহয় এভাবেই হয়। এখানেই বাতায়নের সার্থকতা। তবে সবাই যে বই নিতে এসেছিলেন তাও নয়। সেই দোষে দোষী অষ্ট্রেলিয়ার পতাকাটি। মাঝে মাঝেই কিছু আলপটকা লোকজন ঢুকে পড়ে প্রশ্ন করেন "আপনারা কি অষ্ট্রেলিয়ার ভিসা দেন ?"

সলজ্জ ভঙ্গিতে "না" শুনে হতাশ ও বিরসবদনরা ফিরে যেতে যেতে জানতেও পারলেন না যে আমাদের মনে মনে করা খেদোক্তি, "ভিসা দেওয়ার ক্ষমতা থাকলে তো এমব্যাসিতে বসতাম, বইমেলায় নয়"।

বইমেলা চলাকালীন এক শনিবার ছিলো "চা-ঘর" উপন্যাসের মোড়ক উন্মোচন, মানে বুক লঞ্চ। রমা'দি বেশ উত্তেজিত, হবারই কথা, নতুন বই বলে কথা। দুপুর দুপুর স্টলে এসেছেন। একে একে তখন জড়ো হচ্ছেন আরো লোকজন। এসে পৌঁছেছেন সাহিত্যিক চুমকি চট্টোপাধ্যায়। হন্তদন্ত হয়ে স্টলে ঢুকে কবি তন্ময় চক্রবর্তী ঘড়িটা দেখে নিলেন, নাহ লেট হয়নি। ওনাদের দুজনের হাতে বইয়ের উদ্বোধন হবে। অনুশ্রীদি ও তীর্থঙ্করদা আগেই চলে এসেছেন, নিয়ে এসেছেন গরম গরম নিজের হাতে বাড়িতে বানানো পিঠেপুলি। পৃথিবীর কোনো প্রকাশক আজ অব্দি বুক-লঞ্চে পিঠেপুলি খাইয়েছেন বলে আমার অন্তত জানা নেই। দিদি হেসে বললেন "একটু মিষ্টি মুখ না করালে চলে ?" কবি শঙ্খ ঘোষ তো কবেই বলে গেছেন "আয় হাতে হাত ধরে থাকি"। হই হই করে বুক-লঞ্চ হলো। অগুন্তি শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন মাখা রমাদির কলম হাসতে হাসতে অটোগ্রাফ দিয়ে গেলো প্রতিটি বইতে। বাইরে মাইকে তখন রবীন্দ্রসঙ্গীত, সূর্য ডুবছে বইমেলার এক উজ্জ্বল বিকেলে।

তবে আমার প্রাপ্তির ভাঁড়ার খুব একটা খালি হয়নি। খান পঞ্চাশেক বই কেনা হয়েছে। বিদেশ থেকে বছরে একটাই সুযোগ পাওয়া যায় এক ঝাঁক চেনা অচেনা লেখক লেখিকাদের সৃষ্টির সাথে পরিচিত হওয়ার। রিটার্ন ফ্লাইটে লাগেজের ওজন এক্সট্রা হলো কিনা সে চিন্তা ছিলনা বললে ভুল বলা হবে, একগাদা টাকা গচ্ছা গেলেও যেতে পারতো। দমদম এয়ারপোর্টের কাউন্টারে ছেলেটা বললো "কেবিন লাগেজের ওজনটা বেশী হয়ে গেছে স্যার, ওটাও চেক-ইন লাগেজ করে দিচ্ছি, আপনার কোনো খরচা পড়বে না"।

বোর্ডিং-পাসটা পকেটে গুঁজে স্টারবাকের দিকে হাঁটতে হাঁটতে ভাবলাম 'রাখে হরি মারে কে'। আমার আবার একটু কফি না হলে চলে না।

**কলকাতা বইমেলা ২০২৩ এর সমাপ্তি**

**অমর মিত্র** — প্রখ্যাত সাহিত্যিক অমর মিত্র ২০২২ সালে O'Henry পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন তাঁর ছোটো গল্প 'গাঁওবুড়ো'-র জন্য। গ্রাম ও নগরের মানুষের ঐশ্বর্য হারানোর বেদনা মূর্ত হয় তাঁর রচনায়। তাঁর গল্প উপন্যাসের বিষয় ব্যাপ্ত। দূর মহারাষ্ট্রের ভূমিকম্প পীড়িত লাতুর, কিল্লারি যেমন তাঁর উপন্যাসের বিষয় হয় (নিঃসর্গের শোকগাথা), তেমনি বিষয় হয়ে আসে রাজপুত্র গৌতমের অশ্ব কন্থক, সারথী ছন্দক (অশ্বচরিত)। 'স্বদেশযাত্রা' গল্পের জন্য সর্বভারতীয় কথা পুরস্কার, ১৯৯৮। সমরেশ বসু পুরস্কার, ১৯৯২। নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন পুরস্কার, ১৯৯১। 'অরুন্ধতী তারার রাত' উপন্যাস-এর জন্য অমৃতলোক পুরস্কার, ২০০২। অশ্বচরিত উপন্যাসটি ২০০১ সালের বঙ্কিমচন্দ্র স্মৃতি পুরস্কারে ভূষিত। ২০০৬ সালে আকাদেমি পুরস্কার পান 'ধ্রুবপুত্র' উপন্যাসের জন্য। এই উপন্যাস-ধ্রুবপুত্র গত সাতবছর ধরে নির্মাণ করেছেন লেখক প্রাচীন ভারতের পটভূমিতে। উজ্জয়িনী নগর, শিপ্রানদীর পটভূমিতে নির্মিত এই উপন্যাস সেই সত্যকে প্রতিষ্ঠা করেছে, সময়ের ধূসরতায় কল্পনারও অগোচরে যা থেকে গেছে এতকাল।

**Balarka Banerjee** is a Molecular Biologist by profession and an executive in a Biotech company. Besides science his other passions are Drama — writing, acting, directing — Poetry and Art. He likes good cinema and music. He is a foodie and a good cook. No wonder he enjoys writing about his experiences and interests.

**দেবীপ্রিয়া রায়** — লিখছেন স্কুল ও কলেজের দিন থেকে। পেশায় দর্শন ও তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের অধ্যাপিকা ও গৃহিণী। কাশীর প্রবাসী বাঙালী পরিবারের মেয়ে দেবীপ্রিয়া কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৭৬ সালে ডক্টরেট করে বিবাহসূত্রে সেই বছরেই আমেরিকা এসে শিকাগো শহরে বাসা বাঁধেন। গত ৪০ বছর শিকাগোর বাঙালী ও অবাঙালী সমাজের সাথে নানা ভাবে জড়িয়ে রয়েছেন। সাহিত্য চর্চা দেবীপ্রিয়ার নেশা। শিকাগোর উন্মেষ সাহিত্য গোষ্ঠীর তিনি অন্যতম সদস্য।

**ইন্দিরা চন্দ** — মেয়েবেলা কেটেছে মহারাষ্ট্র-র নাগপুরে। তারপর কোলকাতা। মনোবিদ্যা নিয়ে স্নাতকোত্তর পড়াশোনা করতে করতেই বিয়ে। তারপর কর্মসূত্রে রাজস্থান, গুজরাট, মুম্বাইতে থেকে ২০০১ সাল থেকে দেশের বাইরে। ওমান এবং সংযুক্ত আমিরশাহীতে বেশ কিছু বছর কাটিয়ে ২০০৮ সাল থেকে অস্ট্রেলিয়ার পার্থ-এ পাকাপাকি বাস। পেশায় হলেও নেশায় চিরকালই লেখালেখি। কবিতা, গান, নাটিকা, নাটক সব ক্ষেত্রেই নিজের প্রতিভার ছাপ রেখেছেন তিনি। পার্থ-এর বঙ্গরঙ্গ থিয়েটার গোষ্ঠী ওনার লেখা মঞ্চস্থ-ও করেছে। বহুদিন ধরে কলম ধরলেও তুলি ধরেছেন এই প্রথম। পুরোপুরি স্বশিক্ষিত শিল্পী। নাচ এবং গানে প্রশিক্ষণ থাকলেও আঁকা শেখেননি কোনোদিন। কিন্তু কবিতার বিষয়বস্তু এবং ছন্দের মতন ছবিগুলি রঙের ব্যবহার আর তুলির টান মন কাড়ে তার মননশীলতায়।

**ইন্দ্রাণী দত্ত** — সিডনির বাসিন্দা পেশায় বিজ্ঞানী কিন্তু গল্প লেখার তীব্র আকুতি টের পান। শঙ্খ ঘোষ বলেছিলেন, ''আমরা যখন সত্যিকারের সংযোগ চাই, আমরা যখন কথা বলি, আমরা ঠিক এমনই কিছু শব্দ খুঁজে নিতে চাই, এমনই কিছু কথা, যা অন্ধের স্পর্শের মতো একেবারে বুকের ভিতরে গিয়ে পৌঁছয়। পারি না হয়তো, কিন্তু খুঁজতে তবু হয়, সবসময়েই খুঁজে যেতে হয় শব্দের সেই অভ্যন্তরীণ স্পর্শ।'' ইন্দ্রাণী খুঁজে চলেছেন।

**জয়তী রায়** – বাড়ি কলকাতা। আদতে ভ্রামণিক। ঘুরে বেড়াই এক দেশ থেকে অন্য দেশ। কখনো থাইল্যান্ড, কখনো আমেরিকা, কখনো লন্ডন। মূলত কাজ করি, মানুষের মন নিয়ে। নেশা সাহিত্য। লিখি ছোটগল্প। পৌরাণিক চরিত্র। এবং মনস্তাত্ত্বিক বিষয় নির্ভর নিবন্ধ। উল্লেখযোগ্য প্রকাশিত বই দ্রৌপদী, মুহূর্তকথা, ব্রহ্মকমল, সুপ্রভাত বন্ধুরা। ২০১৯-এ প্রকাশিত জনপ্রিয় বই ছয় নারী যুগান্তকারী। প্রকাশনা : পত্রভারতী।

**মলয় ব্যানার্জী** – কলকাতা। এখনও পর্যন্ত বলার মতো কিছু করিনি, কয়েকবার বলতে গিয়ে বেশ খানিকটা গোলযোগ বাঁধিয়ে ফেলার পর থেকে লেখার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। বলার থেকে লেখার একটা সুবিধে হলো, পাঠকের মনঃপুত না হলেও আমার বিপদের আশঙ্কা কম। বর্তমানে তথ্য প্রযুক্তি কর্মী।

**মানস ঘোষ** — মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ডিপ্লোমা করার পর, বেছে নেন, সমস্ত আবেগ, ভাবালুতা আর ব্যক্তিগত পরিসরকে তছনছ করে দেওয়ার মতো ঝুঁকিপূর্ণ এক পেশা, ভারতীয় রেলের ''ট্রেনচালক''। এই গ্রহে উনিই প্রথম ট্রেনচালক যার দুটি বাংলা কবিতার বই প্রকাশিত হয়েছে। জীবিকা যাপন ও প্যাশনের এই পাহাড়প্রমাণ বৈপরীত্যের যন্ত্রণা কখনো তাঁকে স্তব্ধ করেছে, কখনো আবার আলোকিত বর্ণমালা নিয়ে হাজির হয়েছেন খোলা 'বাতায়ন' পাশে, আমাদের মাঝে।

**নবনীতা বসু হক** – ৭২এ জন্ম। পেশায় অধ্যাপক। নবনীতার এযাবৎ প্রকাশিত উপন্যাস ন'টি। 'প্রেম কাম' এবং উপন্যাসটি মানবতাবাদী পুরস্কার দিয়েছে তাঁকে। তাঁর উপন্যাসের পাঠককে একটি গবেষণা লব্ধ সমাজের চলমানতাকে দেখান নবনীতা। গবেষণাধর্মীতা নবনীতার উপন্যাসে যেমন থাকে, তেমন রসবোধ ও সহজ চলন উপন্যাসকে অন্য মাত্রা দেয়। সমগ্র সাহিত্যচর্চার জন্য 'সমতট' সম্মাননা পেয়েছেন তিনি। কবিতা লিখেছেন মূলত নেটদুনিয়ায়। পেয়েছেন সূচনা পদক, সৃষ্টি সুধা সেরা কবি সম্মান, মন্থন শ্রেষ্ঠ কবি সম্মান। নেপথ্য নারীর জীবন নিয়ে অন্য ধরনের গবেষণা – নেপথ্য নারীর নেপথ্য কথা। বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত সম্পাদিত গল্পগ্রন্থ:ভারতীয়

নারী লেখকের গল্প। প্রায় পঞ্চাশটির বেশি গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে তাঁর। প্রথম গ্রন্থ ১৯৯৪ কলকাতা বইমেলায় 'তিনজনার গল্প'। ২০০৮ এ আমেরিকার পাশে গল্প সংকলন। শঙ্খ ঘোষ ও অশোক মিত্রের ভাল বেশ লেগেছিল আমেরিকার পাশে। গল্প প্রকাশিত হয়েছে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, দিল্লি, গুজরাট ত্রিপুরা ও বাংলাদেশের ঢাকা, রাজশাহী প্রভৃতি জেলায় এবং নরওয়ে থেকে। নবনীতার গদ্যরীতির বড় বৈশিষ্ট্য তীক্ষ্ম ভাষায় অন্বেষণ।

**নূপুর রায়চৌধুরী** – জন্ম, পড়াশুনো কলকাতায়। বোস ইনস্টিটিউট থেকে ডক্টরেট করে বিশ্বভারতীতে শিক্ষাভবনে শিক্ষকতা করেছেন। আমেরিকায় বায়োমেডিক্যাল সাইন্স-এ গবেষণায় যুক্ত। লেখালিখির নেশা। বর্তমানে মিশিগানের বাসিন্দা।

**রমা জোয়ারদার** – দিল্লীর বাংলা সাহিত্য মহলে একটি পরিচিত নাম। গত কুড়ি বছর ধরে দিল্লী, পশ্চিমবাংলা ও উত্তর আমেরিকার বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তাঁর গল্প, প্রবন্ধ, রম্য রচনা ইত্যাদি প্রকাশিত হয়ে চলেছে। বিজ্ঞানের ছাত্রী হওয়া সত্বেও তিনি সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক বিষয়ে ছেলেবেলা থেকেই অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন। প্রকাশিত ছোট গল্প সংকলনঃ (১) রোজ নামচার ছেঁড়াপাতা; (২) সবুজ ঢেউ আর ঝাপসা চাঁদ।

**রমা সিনহা বড়াল** – পেশায় স্থপতি ও নগর পরিকল্পনাবিদ। বি.ই. কলেজের স্থাপত্য বিভাগের স্নাতক ও খড়্গপুর আই. আই. টি নগর পরিকল্পনাবিভাগের স্নাতকোত্তর। "কলকাতা মেট্রোপলিটন ডেভেলপমেন্ট অথরিটি" র নগরোন্নয়ন বিভাগে পরিকল্পনাবিদ হিসাবে কর্মরত ছিলাম। বর্তমানে ঐ বিভাগের "এডিশানাল ডিরেকটর" হিসাবে অবসর গ্রহণ করেছি। অবসর সময় নানা ই-ম্যাগাজিনে কর্মজীবনে নিজের অভিজ্ঞতার গল্প লিখতে ভালবাসি। ছোটবেলায় বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ক্যাম্পাসের সুন্দর পরিবেশে বড় হয়েছি। বাবা ছিলেন স্বনামধন্য শিক্ষাবিদ প্রফেসর শঙ্কর সেবক বড়াল। তাঁর ও আমার দিদি, দাদার উৎসাহে বিজ্ঞান ভিত্তিক কল্প কাহিনী লিখতে ভালবাসতাম। আজ আমার একসাথে বড়ো হওয়া, ছোটবেলার প্রিয়বন্ধু,অস্ট্রেলিয়া প্রবাসী নূপুর (অনুশ্রী) এর উৎসাহে, বিজ্ঞান ভিত্তিক কল্প কাহিনী "জেমস ওয়েব এর টেলিস্কোপ", বাতায়ণের মাধ্যমে বিশ্বের দরবারে পেশ করলাম।

**সঞ্জয় চক্রবর্তী** – অধুনা অষ্ট্রেলিয়ার সিডনি শহরে পাকাপাকি আস্তানা। পেশায় সিভিল ইঞ্জিনিয়ার, সরকারী চাকরীরত কিন্তু নেশায় আদ্যন্ত কবিতাপ্রেমিক। বর্তমানে বাতায়নের ধারাবাহিক সংখ্যা "কাগজের নৌকা" সম্পাদনা সামলেও সমান্তরালে লিখে চলেছেন। বাতায়ন থেকে ইতিমধ্যে প্রকাশিত তার দুটি কাব্য গ্রন্থ "মেঘযাপন" ও "ধুলো রংয়ের বিকেল" পাঠক মহলে যথেষ্ট সমাদৃত। গানের জগতে সঞ্জয়ের বিচরণ অনেক দিনের। তার লেখা গানে কাজ করেছেন কলকাতার জনপ্রিয় শিল্পীরা। অবসরে বাগান করা ও ফটোগ্রাফি হবি।

১৯৯০ থেকে আমেরিকা প্রবাসী **ডঃ শকুন্তলা চৌধুরী** কর্মসূত্রে এবং ভ্রমণপ্রিয়তার কারণে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ, বিভিন্ন ভাষাকে আপন করে নিলেও, বারবার ফিরে ফিরে আসেন এই বাংলায়, তাঁর মাতৃভাষার কাছে এক পরম ভালোবাসার টানে। ক্লাস ওয়ানে পড়ার সময় স্কুলের পত্রিকায় প্রথম একটি কবিতা প্রকাশ হয়। সেই শুরু, তারপর কলেজ, ইউনিভার্সিটি... প্রবাসের বঙ্গ সম্মেলন এবং আরো নানা পত্রিকায় লেখালেখির ধারাটিকে বজায় রেখেছিলেন, যদিও পেশাগত এবং পারিবারিক ব্যস্ততার কারণে সে ধারাটি ছিল নেহাতই ক্ষীণকায় নদীর মতো। দুই মেয়ে বড় হয়ে যাওয়ার পর, ব্যস্ততা একটু কমতেই ... সাহিত্যচর্চার আপাত শীর্ণ নদীটির মধ্য থেকে ফলগুধারা যেন এসে পড়লো সাগরের মোহনায় ! এই জানুয়ারিতে কলকাতায় প্রকাশিত তাঁর বই "পৃথা" বিদগ্ধ পাঠকমহলে সমাদৃত। ছাত্রজীবন, গোখেল কলেজের অধ্যাপনা, প্রবাসজীবন ও বাস্তব পৃথিবীর বিচিত্র সব অভিজ্ঞতা আলো ফেলে তাঁর লেখায়... সেভাবেই একদিন লেখা হয় 'পরবাসী'।

**সিদ্ধার্থ দে** – আই আই টি খড়গপুরের মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ারিঙের স্নাতক। স্নাতোকত্তর পড়াশুনা আমেরিকার ইউনিভার্সিটি অফ নিউ হ্যামপ্শায়ারে। ১৯৯০ সাল থেকে পাকাপাকি ভাবে অস্ট্রেলিয়াতে। দীর্ঘদিন ক্যানবেরা নিবাসী। ২০১৫-তে কর্মজীবন শেষ করে আপাতত সাহিত্য চর্চা, ভ্রমণ, টুকটাক লেখালেখি নিয়ে আছি। আর হ্যাঁ – ফেসবুকে, ওয়াটস্অ্যাপে ইত্যাদি সামাজিক মাধ্যমে সারা পৃথিবীতে ছড়ানো বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডাও জীবনের একটা বড় অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে হালে। আমার মূলত ব্লগধর্মী কিছু লেখা desidd.wordpress.com সাইটটিতে সংকলিত করেছি।

**সৌমিক বসু** – পেশাগত ভাবে তথ্যপ্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ, নেশাগত ভাবে পাঠক। কর্মসূত্রে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রবাসী জীবন অতিবাহিত করলেও, ফিরে ফিরে গিয়েছেন কলকাতায়, বাংলা ভাষার টানে। ২০১৮ সান থেকে স্থায়ীভাবে অস্ট্রেলিয়ার সিডনির বাসিন্দা। পেশাগত ব্যস্ততার মাঝে অবসর সময় অনেকটা কাটে সাহিত্যপাঠ ও সাহিত্য চর্চায়। লেখক হিসাবে বিচরণ মূলত প্রবন্ধ ও রম্যরচনায়।

**সৌমিত্র চক্রবর্তী** – পেশায় চাটার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট। নিজেকে যতটা সম্ভব আড়ালে রেখে আর্থিকভাবে দুর্বল স্কুল পড়ুয়াদের জন্য কাজ করতে ভালোবাসেন। তাদের জন্যেই ভালোবাসার উপহার 'খেলার ছলে' পত্রিকার মূল কান্ডারি। তাঁর কবিতা, ছোটগল্প ইতিমধ্যেই 'দেশ', শারদীয়া আনন্দবাজার, বা সাপ্তাহিক বর্তমানের মত বহুল প্রচারিত পত্রিকায় জায়গা পেতে শুরু করেছে। এবারেই প্রথম কলম ধরেছেন বাতায়নের পাঠকদের জন্য।

**সুদীপ্তা চট্টোপাধ্যায়** – উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএড ও মাইক্রোবায়োলজি নিয়ে স্নাতকোত্তর পড়াশোনার শেষে কিছুদিনের শিক্ষকতা-জীবন। তারপরেই প্রবাসে পাড়ি। গত বাইশ বছর যাবৎ ঠিকানা নিউ জার্সি। পেশায় মন্তেসরি শিক্ষিকা। ২০০৮ সাল থেকে ছদ্মনামে ব্লগলেখা শুরু। ২০১০ থেকে বিভিন্ন দেশ ও বিদেশের পত্রপত্রিকা ও শারদীয়াতে নিজের নামে কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ লেখা চলতে থাকে, কমিউনিটির বিভিন্ন ভলেন্টারি কাজের পাশাপাশি নাটক ও সঞ্চালনা করে সময় কাটাতে ভালবাসেন।

**সুজয় দত্ত** – ওহায়োর অ্যাক্রন বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিসংখ্যানতত্ত্বের (স্ট্যাটিস্টিক্স) অধ্যাপক। জৈবপরিসংখ্যান বিশ্লেষণতত্ত্বের (বায়োইনফর্মেটিক্স) ওপর ওঁর একাধিক বই আছে। কিন্তু নেশা তাঁর সাহিত্যে। সাহিত্য তাঁর মনের আরাম। গত বারো বছরে আমেরিকার আধ ডজন শহর থেকে প্রকাশিত নানা সাহিত্যপত্রিকায় ও পূজাসংখ্যায় তাঁর বহু গল্প, কবিতা, রম্যরচনা ও অনুবাদ বেরিয়েছে। তিনি ''প্রবাসবন্ধু'' ও ''দুকূল'' পত্রিকা সম্পাদনা ও সহসম্পাদনার কাজও করেছেন।

**সুপর্ণা চট্টোপাধ্যায়** – অস্ট্রেলিয়ার পার্থে বসবাস । দুই ছেলে, স্বামী, NRIর সংসার, full time কাজ, ফাঁক ফোকরে লেখা লেখি, লিখবো বলে অনেক কথা খুঁজি / লিখছি যা তার সব মানে কি বুঝি !

এম ডি এন্ডারসন ক্যান্সার সেন্টার-এ গবেষণায় রত **উদ্দালক** অবসরে কবিতা পড়া, লেখা এবং অনুবাদ নিয়ে থাকতে ভালবাসেন। উদ্দালকের কবিতা এবং অনুবাদ, কলকাতা এবং আমেরিকার বিভিন্ন পত্রিকা যেমন প্রবাসবন্ধু, দুকূল, বাতায়ন, সংবাদ-বিচিত্রা, স্বজন, প্রথম আলো, ভাষাবন্ধন, অর্কিড, ম্যাজিক-ল্যাম্প, স্বপ্নরাগ ইত্যাদিতে ছাপা হয়েছে। বঙ্গীয় মৈত্রী সমিতি দ্বারা প্রকাশিত বাংলার বাইরে বসবাসকারী লেখকদের কবিতা সংগ্রহ "কবিতা পরবাসে" এবং আন্তর্জাতিক বিজয়ওয়াড়া সাংস্কৃতিক সংস্থা এবং অমরাবতী দ্বারা প্রকাশিত আন্তর্জাতিক, বহুভাষী কবিতাসংগ্রহ, Poetic Prism-এও স্থান পেয়েছে উদ্দালকের কবিতা। কবিতার বিষয় মূলত প্রেম হলেও, জীবনের আরও নানান উপলব্ধির প্রতিক্রিয়ায়ও উদ্দালক প্রকাশ করে রাখেন তার অনুভব। কখনো তা কবিতা হয়, কখনো শুধুই স্বগতোক্তি। সম্প্রতি নিউ জার্সির আনন্দ মন্দির প্রদত্ত গায়ত্রী স্মৃতি পুরস্কারে সম্মানিত হন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত তার সাহিত্যকর্মের উৎকর্ষতার জন্যে। স্ত্রী নীতি ও পুত্র সায়ন-কে নিয়ে উদ্দালক টেক্সাসের হিউস্টন শহরে থাকেন।

# বাতায়নের প্রকাশিত বই ২০২৩ সালের কলকাতা বইমেলায়

বাতায়ন

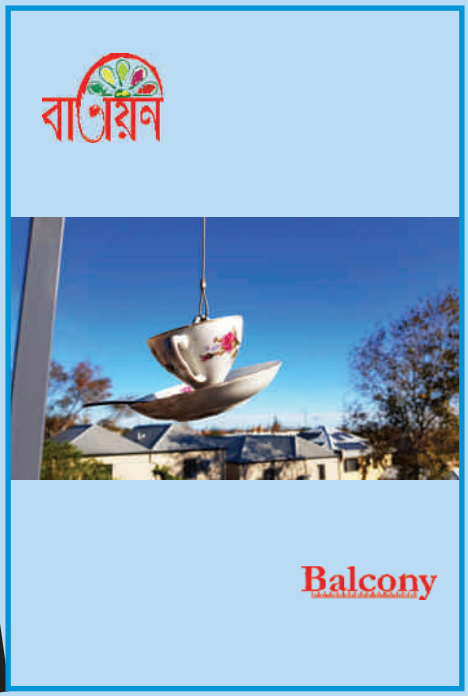

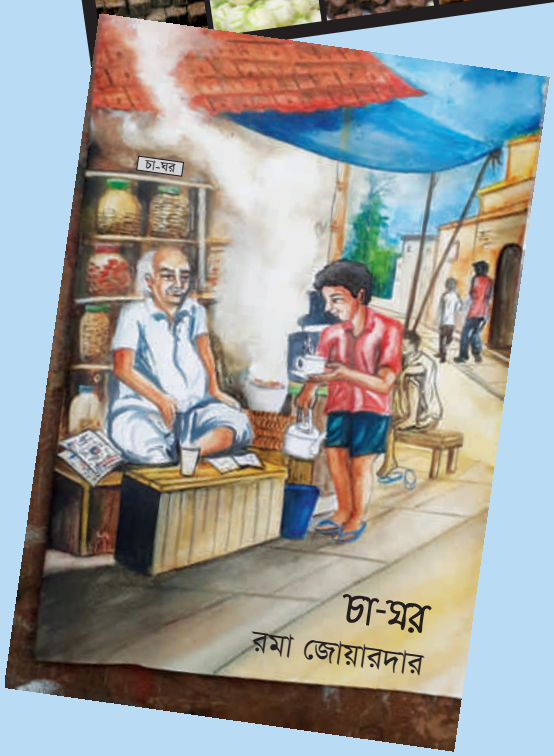


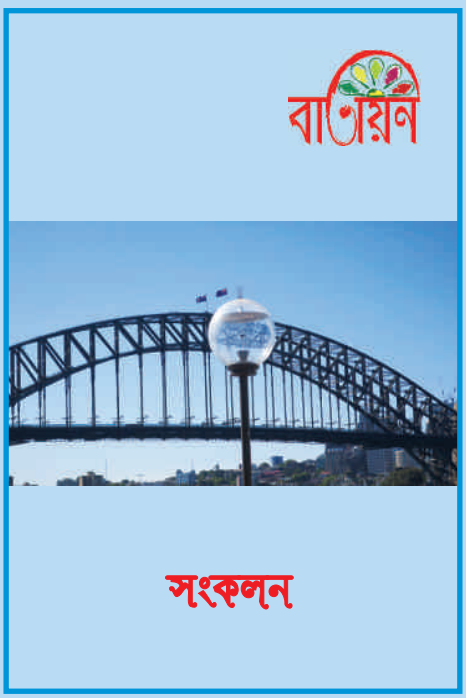

জানালা দিয়ে